🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

২ মাসে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি

১২০+ নম্বরের লক্ষ্যে সঠিক প্রস্তুতি, অনুশীলন ও লেখার কৌশল

১. সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতির সঠিক পদ্ধতি

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন মুখস্থ করা যাবে না। সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতি না নিলে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখায় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা, তথ্য সংগ্রহ, চিন্তাভাবনা এবং লেখার কৌশল আয়ত্ত করা জরুরি।

Best Technique: Current Topics অনুসরণ করে প্রস্তুতি

বর্তমানে যে কারেন্ট টপিকগুলি পাচ্ছ, প্রথমে সেগুলির শুধু শিরোনাম দেখো। বিষয়টি কী নিয়ে, তা বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই পুরো লেখাটি পড়বে না।প্রথমে মনে মনে ভাবো, **তুমি যদি সম্পাদক হতে, তাহলে ওই বিষয়টি নিয়ে কী লিখতে?** বিষয়টি সম্পর্কে নিজের চিন্তাভাবনা থেকে মনে মনে অন্তত ২০টি পয়েন্ট তৈরি করো।

এরপর পুরো লেখাটি পড়বে। পড়ার সময় বিশেষভাবে লক্ষ করবে—

- লেখাটি কীভাবে শুরু হয়েছে---কীভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে---কীভাবে তথ্য ও যুক্তি সাজানো হয়েছে----কীভাবে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে---কীভাবে উপসংহার টানা হয়েছে।

মনে রাখবে, নমুনাগুলিতে সাধুভাষা থাকতে পারে, কিন্তু WBCS পরীক্ষায় প্রমিত চলিত ভাষায় লিখতে হবে। তাই নমুনার ভাষা হুবহু অনুসরণ না করে লেখার ধরন, উপস্থাপনা ও বক্তব্য সাজানোর কৌশল শিখবে।

মূল লক্ষ্য: আগে নিজে ভাববে, তারপর নমুনা পড়ে লেখার কৌশল শিখবে।

২. ১২০+ নম্বরের লক্ষ্যে Practice Rules and Regulations

নিয়ম ১: তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০টি পয়েন্ট ভাবতে হবে

বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় কোনও প্রশ্ন দেখেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখতে বসবে না। বই থেকে উত্তরও দেখে নেবে না।

ধরো, সকালে তুমি একটি প্রশ্ন পেলে। সেই প্রশ্নটি নিয়ে দিনে তিনবার চিন্তাভাবনা করবে।

সকালে: প্রশ্নটি নিয়ে মনে মনে অন্তত ২০টি পয়েন্ট ভাববে।

দুপুরে: আবার একই প্রশ্নটি নিয়ে ভাববে। সকালে যে পয়েন্টগুলি ভেবেছিলে, সেগুলি মনে করার চেষ্টা করবে এবং নতুন কোনও পয়েন্ট মাথায় এলে সেটিও যোগ করবে।

রাতে: তৃতীয়বার প্রশ্নটি নিয়ে ভাববে। পয়েন্টগুলি আরও একবার সাজিয়ে নেবে এবং কোন পয়েন্টের পরে কোন পয়েন্ট লিখবে, তা মনে মনে ঠিক করবে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

এরপর নিজের মতো করে সম্পূর্ণ উত্তর লিখবে। লেখা শেষ হলে মডেল উত্তর দেখবে এবং নিজের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। সবশেষে মডেল উত্তরটি দুবার পড়বে।

এটাই হল প্র্যাকটিস করার সঠিক পদ্ধতি।

নিয়ম ২: প্রতিটি লেখার নিজস্ব ভাষা ও কৌশল শিখতে হবে

মনে রাখবে, সাধারণ প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, সারমর্ম এবং সম্পাদককে পত্র—প্রতিটি লেখার নিজস্ব কাঠামো, ভাষা ও উপস্থাপনার কৌশল রয়েছে।

সব ধরনের লেখা একই পদ্ধতিতে লেখা যায় না। তাই বই থেকে প্রতিটি লেখার নমুনা পড়বে এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবে।

বিশেষভাবে লক্ষ করবে—

১. **বিষয়ের অবতারণা:** লেখাটি কীভাবে শুরু হয়েছে।

২. **তথ্য ও যুক্তির উপস্থাপনা:** কীভাবে মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

৩. **ভাষার ব্যবহার:** কোন ধরনের শব্দ, বাক্য ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. **বক্তব্যের ধারাবাহিকতা:** কীভাবে একটির পর একটি বিষয় সাজানো হয়েছে।

৫. **উপসংহার:** কীভাবে লেখাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

শুধু তথ্য জানলেই হবে না। সেই তথ্যকে সঠিক ভাষায়, উপযুক্ত কাঠামোয় এবং প্রাসঙ্গিক লেখার কৌশল ব্যবহার করে প্রকাশ করতে শিখতে হবে।

শেষ কথা

মুখস্থ নয়, বুঝে শেখো। অন্যের লেখা নকল নয়, নিজের চিন্তাভাবনা থেকে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলো।

নিয়মিত পয়েন্ট তৈরি করা, নমুনা বিশ্লেষণ করা এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুশীলন করার মাধ্যমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার দক্ষতা বাড়াতে হবে। এভাবেই WBCS বাংলা পেপারে ভালো নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

Editorial

আনন্দবাজার পত্রিকা

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

পথের কাঁটা

মসৃণ, প্রশস্ত, দ্রুতগামী জাতীয় সড়ক জাতির উন্নতির প্রতীক। কিন্তু, ভারতে তা আতঙ্কের উৎস। দেশের মোট সড়কের মাত্র ২% জাতীয় সড়ক হলেও, সড়ক-দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ৩০% এখানেই ঘটে। অন্ধকারে সড়ক জুড়ে দাঁড়ানো অতিকায় ট্রাকের সারির মৃত্যুফাঁদ, অন্ধকার দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা রাজস্থান ও তেলঙ্গানায় দু'টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এর পরে শীর্ষ আদালত সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে জীবনের অধিকারের আওতায় সড়ক-নিরাপত্তাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বিধিনিয়ম কঠোরতর করেছে। নির্দেশানুযায়ী, সীমা নির্দিষ্ট করা পার্কিং এলাকা ছাড়া জাতীয় সড়কের যান চলাচলের পিচরাস্তায় কিংবা রাস্তার পাশের সমতল অংশে ভারী বা বাণিজ্যিক যান দাঁড় করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। রাস্তা দখল করে দোকান বা বাণিজ্যিক কাঠামো নির্মাণও বন্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ, প্রযুক্তিভিত্তিক নজরদারি চালু করা ও ৬০ দিনের মধ্যে তা বাস্তবায়িত করার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া, পুলিশ এবং পরিবহণ দফতর একযোগে এই নিয়ম কার্যকর করবে এবং কার্যপদ্ধতি তৈরি ও প্রয়োগের জন্য দায়ী হবেন জেলাশাসকরা। নজরদারি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দায়বদ্ধতার সমন্বয়ের মাধ্যমে সড়ক-নিরাপত্তা বাড়ানোর পক্ষে কাগজেকলমে বেশ সুসংহত, সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ এই রায়।

তবে বিচার বিভাগকে সম্মান জানিয়েই বলা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত গতিও কিন্তু বহুলাংশেই বিপদের অন্যতম হোতা। এর সঙ্গে জোড়ে ঠিক 'লেন'-এ গাড়ি চালানোয় শৃঙ্খলার অভাব, চালকের ক্লান্তি, উজ্জ্বল ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পথনির্দেশিকা, দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে গতি নিয়ন্ত্রক এবং গাড়ির 'রিফ্লেক্টর লাইট' লাগানোয় গড়িমসি। অন্ধকারে ধাবমান যান হঠাৎ, স্থির, আলোকসঙ্কেতবিহীন কোনও বড় প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়লে সামান্য ভুল থেকেও মারাত্মক বিপদ ঘটে। নিয়মিত কঠোর নজরদারির মাধ্যমে এই বিপদগুলি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু, সেখানেই সমস্যা। দেশে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন বা নির্দেশের অভাব নেই, কিন্তু 'ঘন্টা বাঁধে কে'? আদালত নির্দেশিত প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিতে সাফল্যের জন্যও প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা, সদিচ্ছা নিশ্চিত করা জরুরি। বিভাগগুলির মধ্যে দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বিভাজন, গতি নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার, যান ও চালকদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষাও প্রয়োজন। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্তকে চিহ্নিত করে শাস্তির অনমনীয়তা ও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত রাখলেও অবহেলা কমানো যাবে।

দেখা যায়, দূরপাল্লার ভারী যানের চালকেরা অনেক সময়ই পর্যাপ্ত বিশ্রামস্থলের অভাবে পিচরাস্তার পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হন। অর্থাৎ, নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি তাঁদের জন্য পথের পাশে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধাযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত বিশ্রামস্থল আবশ্যক। আদালতের নির্দেশে এই সমস্যার কথাও রয়েছে। সমাধানে চাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ। তাৎক্ষণিক অভিযানের পাশাপাশি নজরদারি নিয়মিত করা চাই। নচেৎ, আইনের কঠোরতা চালকদের শোষণ, জরিমানা ও উৎকোচ আদায়ের পন্থা রূপে ব্যবহার হবে। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, নিরীক্ষণ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও অবিলম্বে পরিকাঠামো নির্মাণের আয়োজন বিনা এমন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও কালগর্ভে হারিয়ে যাবে।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

স্বেচ্ছা-বিস্মরণ

মোবাইল ফোন সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠার আগে যাঁদের সচেতন জীবনের খানিকটা কেটেছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অন্তত দু'-চারটে ফোন নম্বর এখনও স্মৃতি থেকে বলতে পারবেন। সে নম্বর এখন হয়তো তামাদি; যাঁর নম্বর, তাঁর সঙ্গেও হয়তো যোগাযোগ রাখার কোনও কারণ আর অবশিষ্ট নেই— কিন্তু, স্মৃতিতে সে নম্বর থেকে গিয়েছে। যাঁদের মোবাইল-যুগে জন্ম বা বেড়ে ওঠা, খুব ব্যতিক্রমী দু'-এক জন বাদে কেউ কোনও ফোন নম্বর মনে রাখার কথা চিন্তাও করেন না। এক বার স্পর্শেই যে নম্বর ফোনের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে, তা স্মরণে রাখা অনর্থক বলেই মনে হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনও মনে করিয়ে দেয় বিভিন্ন অ্যাপ— ফলে, মনে রেখে শুভেচ্ছা জানানোর আর প্রয়োজন পড়ে না। সে তারিখগুলোও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। শুধু কিছু নম্বর আর তারিখই নয়, যে কোনও তথ্য যে-হেতু এখন আক্ষরিক অর্থেই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যায় 'ওয়েব সার্চ'-এর মাধ্যমে, তাই তথ্য মনে রাখার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা, উভয়ই কমেছে। স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পরিসরে গত দেড় দশকে এই প্রবণতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এর পোশাকি নাম হল ডিজিটাল অ্যামেনেশিয়া বা ডিজিটাল বিস্মৃতি। গত বছর তিনেকে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কৃত্রিম মেধা-নির্ভরতা— শুধু মনে রাখার কাজ নয়, ভাবার কাজগুলোতেও আরও বেশি করে যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠছে মানুষ। এমনকি, যাঁরা সচেতন ভাবে কৃত্রিম মেধা-নির্ভরতা এড়িয়ে চলতে চান, তাঁরাও। পথ চেনানোর দায়িত্ব এখন জিপিএস-নির্ভর অ্যাপের হাতে; কোন জিনিসটা কিনলে আর কোনটা কেনা উচিত, সে কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে ই-কমার্সের কৃত্রিম মেধা-চালিত ব্যবস্থা; এমনকি, মাইক্রোওয়েভ আভেনের মতো সাদামাঠা যন্ত্রও এখন নিজে ভাবতে শিখেছে, কোন খাবার গরম করতে কত ক্ষণ চলতে হবে।

স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠছে, মানুষ কি শেষ অবধি ভাবতে ভুলে যাবে? আশঙ্কাটি যে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু, যন্ত্র ও কৃত্রিম মেধার দাপট যে মানুষের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করছে, গবেষণাতেও তা স্পষ্ট। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের উপস্থিতিতেই মানুষের 'কগনিটিভ এবিলিটি' বা ভাবার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, সে মুহূর্তে যন্ত্রগুলি ব্যবহার না করলেও। এমনকি, একটি গবেষণা বলছে, কম্পিউটার বা স্মার্টফোন সামনে থাকারও দরকার নেই, মানুষের ভাবার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে সেগুলির উল্লেখই যথেষ্ট। নাগালের মধ্যে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন না-থাকলে নিজের জানা, এবং বিবেচনার ক্ষমতা বিষয়েও সন্দেহ তৈরি হয় মানুষের মনে। অন্য দিকে, কেউ নিজে কতখানি জানেন, সেই আত্মবীক্ষণের ক্ষমতাও প্রভাবিত হয় অতিরিক্ত ইন্টারনেট-নির্ভরতায়। কোন তথ্যটি সত্যই নিজের জানা, আর কোনটি ইন্টারনেট থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব বলে তা 'জানা' বলে মনে হচ্ছে, অনেকের কাছেই সেই সীমারেখাটি ঝাপসা হয়ে যায় বলে গবেষণায় প্রকাশ। অর্থাৎ, সহায়ক থেকে যন্ত্র ক্রমে নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে, মানুষের অগোচরেই।

এই পরিণতি কি অনিবার্যই ছিল? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, না। যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক কাজের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে, তার মগজের ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব তুলনায় জটিলতর সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু, যান্ত্রিক কাজের থেকে মুক্তিকে আলস্যের সুযোগে পরিণত করলে সমূহ বিপদ। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা এ কথাও জানাচ্ছেন, মনে রাখার মতো যান্ত্রিক কাজে মস্তিষ্কের যে ব্যবহার হয়, তা অন্য কাজের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। কাজেই, যান্ত্রিক কাজগুলি থেকে মুক্তি মিললেও মস্তিষ্কের ব্যায়াম ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হবে। কৃত্রিম মেধার সাহায্যে যে কাজগুলি করা যায় না, যে কাজে অধিকতর সৃষ্টিশীলতা প্রয়োজন, সে কাজে আরও বেশি মনোনিবেশ করা জরুরি। আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনোযোগী হওয়ার। চার পাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে অজস্র ঘটনা— তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ, কিছু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, বিবর্তনের দীর্ঘ যাত্রা মানুষের মস্তিষ্ককে বিভিন্ন আপাত-অসম্পর্কিত ঘটনার মধ্যেও নিহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম করেছে। তার জন্য প্রয়োজন চার পাশের ঘটনায় মনোযোগী অভিনিবেশ। সেই সঙ্গে প্রয়োজন— দ্রুত ও সহজলভ্য উত্তর খোঁজার প্রবণতা থেকে সচেতন ভাবে দূরে থাকা। নিজের বিচারবুদ্ধির নিত্য ও ক্রমাগত অনুশীলনই মানুষকে যন্ত্রের দাসে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। স্বেচ্ছা-বিস্মরণ থেকে রক্ষা করতে পারে নিজেকে।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

মুষল পর্ব

বিহারের কিষাণগঞ্জ জেলার বাখাতোলি গ্রামের মৌলানা তৌসিফ রাজার দেহ মিলেছে রেললাইনের ধারে। রেলপুলিশের বয়ান, দরজার ধার ঘেঁষে বসে থাকা ওই ব্যক্তি পিছলে কামরা থেকে পড়ে গিয়েছেন, লাইনের ধারের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়েছেন, এটি দুর্ঘটনা। অথচ, প্রয়াতের স্ত্রী তবস্‌সুম খাতুন পাল্টা অভিযোগ করেছেন যে কেবল দাড়ি রাখা ও মাথা আচ্ছাদিত রাখার কারণে তাঁর স্বামীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে হিংসা-উন্মত্ত জনতা। তিনি ভিডিয়ো কলে স্বামীর উপরে হামলার দৃশ্য দেখেছেন এবং এই দাবির সপক্ষে ভিডিয়ো প্রমাণও পেশ করেছেন। বরেলীর এই সংবাদের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা একেবারেই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তা সমকালীন ভারতের প্রায় মজ্জাগত হয়ে ওঠা এক অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। কখনও গোমাংস ভক্ষণ, কখনও শিশুচুরির অভিযোগ, কখনও ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে বারে বারে জনতা চড়াও হচ্ছে সহনাগরিকের উপর। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উস্কানির আগুনে তপ্ত হয়ে উঠে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের তোয়াক্কা না করে এ ভাবে সাধারণ মানুষ শাস্তির দণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে তাণ্ডব শুরু করলেই সৃষ্টি হয় অরাজকতা।

গণপিটুনি তো কোনও বিচার নয়, তা বেআইনি এবং এক সংগঠিত হত্যাকাণ্ড। পেহলু খান-সহ বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, সন্দেহের চোখে দেখলেই শাস্তি দিতে উদ্যত হয়ে উঠছে জনতা। গুজব, সমাজমাধ্যমের অপপ্রচার এবং ধর্মীয় বা জাতিগত উত্তেজনা তাদের নিমেষে হিংস্র করে তুলছে। এই হিংসার মূলে রয়েছে 'অপর'-এর প্রতি বিদ্বেষ, যে কোনও ভাবে নিজের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের আয়না-ছবিটির সঙ্গে না মিললেই আক্রমণের ফুটন্ত বাসনা। যে-হেতু, ভিড়ের মধ্যে দোষীকে চিহ্নিত করায় অসুবিধা রয়েছে, তাই অপরাধীরা বারে বারে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। ফলে, এক প্রকার সামাজিক বৈধতা পেয়ে ভয়ঙ্কর এই রক্তলিপ্সা অবদমিত অবচেতন থেকে বারে বারে নখ-দাঁত বার করে প্রকাশ্যে আসছে। উত্তরপ্রদেশের মর্মান্তিক ঘটনাটির মতো, বহু ক্ষেত্রেই পুলিশ ও প্রশাসন এমন ঘৃণার রাজনীতি প্রসূত অপরাধকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে সাজিয়ে লঘু করে সমর্থন জোগাতে দেখা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ও মনোভাব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করে, মানবাধিকারকে ধূলিসাৎ করে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানস্বীকৃত ব্যক্তির অধিকারকে নস্যাৎ করে। গণতান্ত্রিক আইনবদ্ধ সমাজে এই ঘটনাকে চলতে দেওয়া সভ্যতার পরাজয়।

নাগরিক নিরাপত্তা এবং অপরাধ ও অপরাধীকে শনাক্ত করে বিচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, কখনওই জনতার নয়। বস্তুত, শীর্ষ আদালত গণপিটুনি রোধে নোডাল অফিসার নিয়োগ, দ্রুত তদন্তের ক্ষেত্রে জোর দেন বারংবার। সম্প্রতি এক রায়ে ফের জানিয়েছেন, ঘৃণাভাষণ ও ঘৃণার রাজনীতি থেকে উদ্গিরিত অপরাধ মোকাবিলায় বিদ্যমান আইনেই যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে; প্রয়োজন কেবল নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগ। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রয়োগই বার বার অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, রাজপথ বা রেলের মতো জনবহুল পরিসরে কেন এমন সঙ্ঘবদ্ধ ঘৃণার অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই? কেনই বা আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে প্রমাণ উপস্থিত করলে তবেই প্রশাসনের জগদ্দল পাথরটিতে আঁচড় পড়ে? এই অনর্গল গরলধারার পিছনে একটি বিপন্ন, বিদীর্ণ সমাজ, যার সুস্থতা, নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কেই।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সহায়হীন

এলপিজি সঙ্কট এবং পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ-উদ্ভূত বাণিজ্যিক পরিস্থিতির জন্য অগণিত পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়ে ফিরে আসছেন পশ্চিমবঙ্গে। অথচ, গ্রামগুলিতে দীর্ঘ কাল স্থগিত একশো দিনের কাজের (মনরেগা) প্রকল্প। গ্রামীণ কাজের নতুন প্রকল্প, 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন-গ্রামীণ' রূপায়ণও শুরু হয়নি। মনরেগা থেকে নয়া প্রকল্পে পৌঁছতে সময় লাগবে, তা ধরে নিয়েই এ বছর কেন্দ্রীয় বাজেট মনরেগার জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, এবং নয়া প্রকল্পে ৯৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ১৯ এপ্রিল কেন্দ্র মনরেগার জন্য প্রথম দফার ১৭,৭৪৪ কোটি টাকা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে সে টাকা আদৌ পৌঁছবে কি? ভিবি-জিআরএএম-জি প্রকল্পের পরিকাঠামো (যার মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের মুখ চেনার ডিজিটাল ব্যবস্থা) তৈরির কাজ শুরু হয়নি। সারা দেশেই মনরেগা খুঁড়িয়ে চলছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে যত কর্মদিবস তৈরি হয়েছে, তা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫-এর তুলনায় অন্তত ৩০ শতাংশ কম। মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি বাড়ানো হয়নি, ১০ হাজার কোটি টাকা মজুরি বকেয়া রয়ে গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পাওনা অন্তত দেড় হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২১-এ গ্রামে সরকারি কাজের খরা শুরু হয়েছিল, আজও তা কাটেনি। আদালতের নির্দেশ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি, কোনও কিছুই পশ্চিমবঙ্গের মনরেগায় প্রাণসঞ্চার করতে পারেনি। ভোটের ঢক্কানিনাদে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ, প্রতিবাদ, সবই চাপা পড়ে গিয়েছে।

গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তার অভাব সবচেয়ে তীব্র ভাবে অনুভূত হয় যখন বহু মানুষ এক সঙ্গে কাজ হারান। কোভিডের সময়ে কর্মচ্যুতি এবং রোজগারহীনতার 'শক' কাটাতে সাহায্য করেছিল মনরেগা-র কাজ। এ বার তা-ও নেই। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বহু রাজ্যের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ভিন রাজ্যে কর্মরত, তাঁদের কাজ বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। যখনই অতিমারি, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অপর কোনও সঙ্কট বড় আকারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে বেসামাল করবে, তখন এক সঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ হারাবেন, তা আজ প্রত্যাশিত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত যদি তাঁদের বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করা না যায়, তা হলে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব, সঞ্চয়ের ক্ষয়, ঋণগ্রস্ততা, অচিকিৎসা, এমন নানা সমস্যা গ্রাস করবে শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে। আজ রাষ্ট্র ও বাজারব্যবস্থা চুক্তি এবং গিগ কাজের মাধ্যমে শ্রমশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারে বিশ্বাসী। ফলে শ্রমবাহিনীর একটি বড় অংশ কোনও নির্দিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকছে না। যে শিল্পে যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সে ভাবে নিযুক্ত হচ্ছে। তার কিছু সুফল শ্রমিকেরাও পাচ্ছেন— রোজগারে বৃদ্ধি, নানা ধরনের কাজে দক্ষতা তৈরি, পছন্দের কাজ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ, প্রভৃতি। কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে কর্মনিরাপত্তার অভাব। চুক্তি-নির্ভর, নমনীয় নিয়োগব্যবস্থাকে ন্যায্য, দীর্ঘমেয়াদি এবং দারিদ্র-প্রতিরোধী করতে হলে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে শক্তসমর্থ করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি যুদ্ধ ও এলপিজি-র দামবৃদ্ধির জন্য কর্মহীন শ্রমিকরা সুরাত থেকে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে গিয়ে চরম নাকাল হলেন, পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হলেন। সন্ত্রস্ত মানুষের ছুটোছুটির দৃশ্য দেখিয়ে দিল যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার কাজ হয়েছে অতি সামান্যই। সঙ্কটের মোকাবিলা করতে নিয়োগকারী অথবা স্থানীয় সরকার, কোনও পক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াল না। আপৎকালীন সহায়তা থেকে ঘরে ফেরার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, কিছুই হল না। 'বলে দিয়ো বন্ধু, আর আসব না' সুরাতের এক পরিযায়ী শ্রমিকের এই কথা দেশবাসীকে বিদ্ধ করেছে। যাঁদের শ্রমের উপর দেশ নির্ভর করে, তাঁরা আর দেশের প্রশাসনের উপর নির্ভর করতে পারছেন না— দেশের সরকার বা নাগরিক সমাজ, কোনও পক্ষই এই দায় এড়াতে পারে না।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সবুজের সুরক্ষা চাই

রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে, প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়। কিন্তু কলকাতা শহরের কিছু স্থানের দুরবস্থা-চিত্রটি বিন্দুমাত্র পাল্টায় না। ব্রিগেড ময়দান সেই তালিকার অন্যতম। সম্প্রতি রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের জন্য ব্রিগেড ময়দানকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। সুসজ্জিত ময়দানে সে দিন উপস্থিত ছিলেন অগণিত মানুষ। কিন্তু 'চাঁদের হাট' ভেঙে যাওয়ার পরেই স্পষ্ট হয় ব্রিগেডের হতশ্রী দশাটি। অসমান জমি, কাদা, অস্থায়ী কাঠামোর চিহ্ন নিয়ে ব্রিগেড ময়দান ফিরেছে তার পুরনো অবস্থানেই, যা প্রায় প্রতি সমাবেশের পর কলকাতাবাসীর পরিচিত দৃশ্য। সংবাদে প্রকাশ, জঞ্জাল সরানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, সরছে অস্থায়ী কাঠামোও। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের তাতে সুরক্ষা হয় কি? একটি দিনের জন্যই যে ক্ষতি হয় মাঠের সবুজের, মাটির বাস্তুতন্ত্রের, অত সহজে— কেবল জঞ্জাল সরালেই— সেই ক্ষতি পূরণ হয় কি? আসলে, এ দেশের পরিবেশ ভাবনার গোড়ায় গলদ। আগে ক্ষতি করে তার পর সেই ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা কোনও ভাবেই সুফল দিতে পারে না। ইংল্যান্ড আমেরিকার মতো দেশেও নির্বাচন হয়, তার প্রচার হয়, ভোটের সাফল্য উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু মাঝখান থেকে পরিবেশের বারোটা বাজানোর মতো কিছু ঘটে না— কেন? কেন, সেটা এই দেশের সরকারি মহলগুলি একটু ভেবে দেখতে পারে কি?

নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়ে 'প্রশাসন' হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছে। সেই প্রশাসনের যাত্রারম্ভটি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে শুরু করা যায় কি? স্লোগানের ঢেউ তুলতে, দাবিদাওয়া জানাতে, জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে শক্তি প্রদর্শনে 'ব্রিগেড চলো'র আহ্বান যেমন বঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির মুখে অহরহ শোনা যায়, সেই একই আগ্রহ ময়দানের পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখায় দেখা যায় না। নিজ স্বার্থে ব্যবহারের পর ভুলে যাওয়া— রাজনীতির পরিচিত লক্ষণ। ব্রিগেড ময়দানের প্রতি ধূলিকণা তার মর্মার্থ জানে। শুধুমাত্র জঞ্জাল সরালেই ময়দান বাঁচবে না। অবিলম্বে সভা-সমাবেশের অত্যাচার থেকে তাকে মুক্ত করা জরুরি। কলকাতার মতো ধূলিধূসরিত শহরে ময়দানের সবুজের গুরুত্ব অপরিসীম। ময়দানের সামগ্রিক দূষণমুক্তি কোন পথে হবে, অবিলম্বে নতুন প্রশাসনকে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প সমাবেশ স্থান বেছে নিতে হবে।

এক সময় জাতীয় পরিবেশ আদালত ব্রিগেডে শর্তসাপেক্ষে সভা করার অনুমতি দিয়েছিল। অতঃপর পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, তা হল— সমাবেশের পরই পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ আবর্জনা পরিষ্কারের কাজটি শুরু করে দেয়। কিন্তু তা নিয়েও 'আমরা-ওরা'র রাজনীতি বন্ধ হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, ব্রিগেডে শাসক দলের সভা-অন্তে সে দিনই জঞ্জাল পরিষ্কারে তৎপর হয় পুরসভার কর্মী-বাহিনী, যে তৎপরতা বিরোধীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমস্ত দলের প্রতি দাবি, সমাবেশের পর সেই স্থানকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতেই হবে। তাঁদের কর্মী-সমর্থকেরা পরিবেশ নষ্ট করবেন, আর তাকে রক্ষা করবে অন্যরা— উষ্ণায়নের প্রবল বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে। কলকাতার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যেটুকু সবুজ বেঁচে আছে, তাকে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। প্রশাসনকে, নাগরিককেও। এর সূচনাটিও নাহয় ব্রিগেডের হাত ধরেই হোক।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

জোর যার?

ভোট শেষ, নতুন সরকার, রাজ্যে নতুন উদ্দীপনা দৃশ্যমান। যে কোনও পরিবর্তনই সম্ভাবনাময়, বিশেষত দীর্ঘ অসক্রিয়তা ও পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের মধ্যে অনেকখানি আশা দেখা স্বাভাবিক। তবে আশার পাশে আশঙ্কার অন্ধকারও ঘনায়মান: নতুন মন্ত্রিসভা কাজ শুরুর আগেই সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি। দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশের পরে পশ্চিমবঙ্গেও কি এ বার 'বুলডোজ়ার' সংস্কৃতির আবির্ভাব হল— এই হল প্রথম আশঙ্কা। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দিনই নিউ মার্কেট এলাকায় বুলডোজ়ার নিয়ে বিজেপি সমর্থকদের বিজয় মিছিল দেখে দোকান বন্ধ করে দেন বহু হকার। বিজেপি কর্মীদের ধমক-চমকের কথাও এসেছে সংবাদে। হয়রানির ভয়ে কয়েক দিন মালপত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন হকাররা। রবিবার থেকে তাঁরা ফিরে এসেছেন নিজেদের জায়গায়। বার্ট্রাম স্ট্রিট, হুমায়ুন প্লেস-এর ফুটপাত, রাস্তা দখল করে বিকিকিনি চলছে আগের মতোই। উঠে যাওয়া এবং ফিরে আসার এই পালা কলকাতার রাস্তায় বহু দশক চলছে।

কলকাতার রাস্তা এবং হকার-সমস্যা নতুন নয়, দীর্ঘ ও জটিল তার ইতিহাস। অধিকাংশ হকার অবৈধ, পুরসভা-পুলিশের দাক্ষিণ্যে ব্যবসা চালাচ্ছেন, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু বুলডোজ়ার দিয়ে উচ্ছেদ তার সমাধান নয়। কারণ, সঙ্কটের উৎস খোদ প্রশাসন। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় হকারদের আধিক্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে হকার নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল কলকাতার হকার সমীক্ষা। বছর ঘুরে গেলেও তা শেষ হয়নি, ভেন্ডিং-এর শংসাপত্র পাননি কোনও হকার। পুর সচিবালয় গত বছর কলকাতায় প্রায় ৫৪ হাজার বৈধ হকারের তালিকা তৈরি করেছিল, যদিও তাঁদের মধ্যে নাকি মাত্র ৮,৭২৭ জন সমস্ত বিধি মেনে ব্যবসা করছেন। বাকি ৪৫ হাজার 'বৈধ' হকারদের বিচ্যুতিগুলি সংশোধন হবে কী করে, অবৈধ হকারদের পুনর্বাসন হবে কি না, তার উত্তর মেলেনি। এ বার কি এই চোর-পুলিশ খেলার নতুন পর্ব শুরু হবে, কেবল বদলে যাবে 'জরিমানা' আদায়ের হাতগুলো?

সমস্যার শিকড় গভীরে। এ রাজ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্র অধিকাংশ মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন জোগায়। তাকে 'অবৈধ' করে রাখা হয়েছে সরকারি ভাবেই। এর থেকে তোলা আদায় ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা পেয়েছেন শাসক। নিজের জীবিকা রক্ষার তাগিদে দলকে সমর্থন করতে বাধ্য হন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বনিযুক্ত এবং শ্রমজীবী মানুষ, এই ছিল তাঁদের হিসাব। দলীয় রাজনীতির এই নিকৃষ্ট কৌশল বার বার হকার-সমস্যার প্রশাসনিক সমাধানের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। হকারদের অধিকার সুরক্ষায় কেন্দ্র আইন তৈরি করেছিল ২০১৪ সালে। পশ্চিমবঙ্গে সেই অনুসারে হকারদের নথিভুক্তি, তাদের বসার জায়গা নির্ধারণ, 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি' তৈরি করে হকারদের নিয়ন্ত্রণ করা— সব বিধি-ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ২০১৮ সালে। হকারদের লাইসেন্স, ফুটপাতে এবং রাস্তার মোড়ে কত জায়গা ছাড়তে হবে, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, কোনও দোকানের প্রবেশদ্বারের সামনে বসা চলবে না, শহরের কয়েকটি এলাকাকে হকারদের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে, এমন নানা নির্দেশ জারি করেছেন পুর-কর্তৃপক্ষ। সে সব বিধি কার্যকর হয়নি, আইনের শাসনের অভাবে এক অনিয়ন্ত্রিত, জটিল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। অতএব পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার 'অবৈধতা'-র জন্য দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষকে 'অপরাধী' বলে ঠাহর করলে এই মানুষগুলির প্রতি যেমন অন্যায় হয়, তেমনই ভুল হয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে। বুলডোজ়ার চালিয়ে কিংবা লাঠির ঘায়ে হকারের দোকান গুঁড়িয়ে দিলে কিছু উত্তেজক দৃশ্য তৈরি হয়, পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে না। নতুন সরকারের সামনে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে হকার-সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার। ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সেই কাজ করা হোক।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

অধিকারের লড়াই

লড়াই চলছে ২০২৩ সাল থেকেই। নিজেদের জীবন-জীবিকা-বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখার লড়াই, জমিকে বহুজাতিক সংস্থার গ্রাস থেকে সুরক্ষিত রাখার লড়াই। সেই বছরেই ওড়িশা সরকার রায়গড়া এবং কালাহান্ডি জেলার এক বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিজিমালির বক্সাইট খনিটিকে তুলে দেয় এক বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর হাতে। এই প্রকল্প এলাকায় আনুমানিক ৩০ কোটি টনেরও বেশি উচ্চমানের বক্সাইট সঞ্চিত আছে। স্বাভাবিক ভাবেই সরকার এবং শিল্পপতি গোষ্ঠীর নজর পড়েছে তাতে। কিন্তু, এই জমি দলিত এবং জনজাতি সম্প্রদায়েরও ঠিকানা, যাঁরা এই জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। সিজিমালি লাগোয়া গ্রামগুলির সদস্যরা একজোট হয়ে ২০২৩ সালেই দাবি তুলেছিলেন, ওই সংস্থাকে দেওয়া খনির ইজারা বাতিল করা হোক। কারণ, এই প্রকল্প পরিবেশগত ছাড়পত্র পেলে তাঁরা নিজেদের বাসভূমি, অরণ্য, এবং নদীর অধিকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হবেন। সেই প্রতিবাদই এই বছর আরও জোরালো হয়েছে। এপ্রিলের গোড়ায় বক্সাইট খনির সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই জখম হয়েছেন অনেকে।

এর পরেও জনজাতিভুক্তদের ক্ষোভ, প্রতিবাদের পরোয়া করেনি সরকার। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এক রেল করিডরের কথা জানানো হয়েছে সিজিমালি এবং কুক্রমালি খনির জন্য। আধিকারিকরাও স্পষ্ট করেছেন, এই বিশেষ রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্যই খনিজ উত্তোলনকে জোরদার করা। এই পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয়। ২০২৩ সালের বন সংরক্ষণ আইনের নতুন সংশোধনের মধ্যেই তার আভাস মিলেছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তা অরণ্যের সংজ্ঞাকে সঙ্কীর্ণ করেছে, জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির দরজা শিল্পগোষ্ঠীদের কাছে মুক্ত করে দিয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে ২০০৬ সালের তফসিলি জনজাতি এবং অরণ্যে বসবাসকারী মানুষদের অরণ্য অধিকার আইনকেও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামসভার অগ্রিম অনুমতি ছাড়াই বেসরকারি সংস্থার অরণ্যে প্রবেশের পথটি উন্মুক্ত হবে। যদিও, কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এর মূল উদ্দেশ্য সরকারি-বেসরকারি মিলিত উদ্যোগে জঙ্গলের নষ্ট হয়ে যাওয়া জমিতে নতুন করে অরণ্য সৃষ্টি, কিন্তু সাম্প্রতিক নিকোবর, সরিস্কা, উত্তরাখণ্ডের উদাহরণ দেখে সেই আশ্বাসবাণীতে ভরসা রাখা কঠিন।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অভিযোগ উঠেছিল যে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে পরিবেশ আইন শিথিল করার যাতে অনৈতিক ভাবে বাড়তি খনিজ তোলা যায় বা কোনও এলাকায় তেলের কূপ খননের জন্য স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করার মতো নিয়মের হাত থেকে রেহাই মেলে। অভিযোগ সত্য হলে বন সংরক্ষণ আইনের সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ২০১৩ সালে এই একই সংস্থা এবং ওড়িশা সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এক ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ওড়িশার ডোঙ্গরিয়া কন্ধ জনজাতিভুক্ত মানুষরা। পবিত্র নিয়মগিরি পাহাড় রক্ষায় তাঁদের অধিকার মান্যতা পেয়েছিল। কিন্তু তার পরেও তাঁদের উচ্ছেদ হওয়া, হেনস্থা ঠেকানো যায়নি। সিজিমালির ভবিষ্যৎ এখন সঙ্কটে নিমজ্জিত।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

জঙ্গল ‘পণ্য’ নয়, বাস্তুতন্ত্র

সম্প্রতি জাতীয় পরিবেশ আদালত ‘গ্রেট নিকোবর প্রোজেক্ট’-কে পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে। ফলে পরিবেশ ও বিপন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপপুঞ্জে পণ্যবাহী জাহাজের ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শহর নির্মাণে আর কোনও বাধা রইল না। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যেমন জীববৈচিত্রে ভরপুর, তেমনই ছ’টি অত্যন্ত বিপন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর বাসস্থান। নিকোবর অঞ্চলে নিকোবরি ও শম্পেন জনজাতিভুক্তদের দেখা যায়। ভারতে যে ৭০৫ তফসিলি জনজাতি রয়েছে, তার মধ্যে বেশ কিছু জনজাতি গোষ্ঠী অত্যন্ত বিপন্ন। ভারত সরকার গঠিত ইউ এন ধেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সব বিপন্ন জনজাতিভুক্তের উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে একটি বিশেষ শ্রেণি তৈরি করা হয়, যাদের বলা হয় ‘প্যার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ’ বা ‘পিভিটিজি’। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ছ’টি জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচটিই এই বিশেষ শ্রেণির মধ্যে পড়ে। এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি জমি ও জঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই জনজাতিভুক্তদের জমি ও জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ধ্বংস হবে।

২০১১-র জনশুমারি অনুযায়ী শম্পেনদের সংখ্যা ২২৯। আর নিকোবরি-দের সংখ্যা ১২০০-র কাছাকাছি। শম্পেনরা নদী উপত্যকার সংরক্ষিত বনভূমিতে বসবাস করেন আর নিকোবরিরা পশ্চিম উপকূলে কিছুটা চাষবাস, প্রধানত প্ল্যান্টেশন-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০৪-এর সুনামিতে তাঁদের জমিজমা বন্যায় ভেসে যায় এবং এঁরা ক্যাম্পবেল বে-র ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন। ১৬৬ বর্গকিমি জমিতে সুবিশাল প্রকল্প গড়তে এই সব বিপন্নদের জন্য সুরক্ষিত অঞ্চল ও বনভূমি নেওয়া হচ্ছে। জনজাতিভুক্তদের জমি ও বিচরণক্ষেত্র কতটা নেওয়া হবে, সেটা মানচিত্রে সুস্পষ্ট নয়। শুধু জনজাতি সংরক্ষিত অঞ্চল, জাতীয় উদ্যান ও রাজস্ব গ্রামের সীমানা পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রকল্পে জনজাতিভুক্তদের জমি ও বাসস্থানে জনজাতি-বহির্ভূত মানুষদের প্রবেশ রুখতে ১৯৫৬ সালের ‘আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস প্রোটেকশন অব অ্যাবরিজিনাল ট্রাইবস রেগুলেশন’ আইন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। অচিরেই এই বিপন্ন জনজাতিভুক্তদের নিজের জমি ও জঙ্গল থেকে উৎখাত হতে হবে।

২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী, প্রকল্পের জন্য কোনও জমি নিতে হলে ‘সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন’ ও যাঁদের জমি নেওয়া হবে তাঁদের সম্মতি আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের সময় স্থানীয় জনজাতি গোষ্ঠীর বক্তব্য শোনা হয়নি বলে দাবি। এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন করার আগেই স্থানীয় বন ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতর প্রকল্পের পক্ষে তাদের সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে। পরে অবশ্য নিয়ম রক্ষার্থে একটি বেসরকারি সংস্থা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০২২ সালের বন সংরক্ষণ আইন-এর নতুন বিধির বলে ওই জনজাতিভুক্তদের প্রাক্-সম্মতিও নেওয়া হয়নি। বিধি অনুযায়ী, জঙ্গলের জমিতে বিভিন্ন ‘উন্নয়ন’মূলক কাজ বা খনন কাজে বেসরকারি সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অনুমতি দেবে। এর জন্য স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকার অনুমতি দেবে বন উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে, যেখানে সরকারি আমলার প্রাধান্যই বেশি। আদিবাসীরা জঙ্গলের মুখ্য অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও কমিটিতে তাঁদের স্থান নেই। এ ছাড়া জমি থেকে উৎখাত করতে গেলে আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়, তার পর উৎখাত করা যায়। এর কোনওটাই মানা হয়নি। এই প্রকল্পের জন্য বিপন্নরা দ্বিতীয় বার পাকাপাকি ভাবে বাস্তুচ্যুত হতে চলেছেন। তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে কি না, করলে কী ভাবে করা হবে বা কোথায় করা হবে, স্পষ্ট নয়। গবেষণা জানাচ্ছে, ভারতে প্রায় সমস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পে উৎখাত হওয়া মানুষের অবস্থার অবনতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বলা হচ্ছে, এই প্রকল্পে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের শহর গড়ে তোলা হবে। এর ফলে দ্বীপপুঞ্জে দ্রুত জনসংখ্যাগত পরিবর্তন হবে, ফলে বিশেষত শম্পেনদের জীবনে প্রভূত প্রভাব পড়বে। ইতিহাস বলছে, ছোঁয়াচে রোগ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, জমি বিচ্যুতি অন্যদের তুলনায় ছোট গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বেশি ফেলে। বহিরাগতদের সংস্পর্শে সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা বাড়বে এবং জনসংখ্যা নাটকীয় ভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও প্রকল্পে বিভিন্ন রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে, ট্রাইবুনাল সেটা যথাযথ ভাবে পালন করতে নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু রক্ষাকবচের নিয়মকানুন কতটা বাস্তবে মানা হবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। এই প্রকল্পের ফলে স্থানান্তরিত উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের ক্ষতিগ্রস্ত বা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, দ্বীপপুঞ্জের বাস্তুতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট অবস্থান-কেন্দ্রিক। এটা অন্যত্র নতুন করে তৈরি করা যায় না। এই নির্দিষ্ট সমুদ্র-উপকূলবর্তী বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে স্থানীয় মাটি, উদ্ভিদ, অণুজীব ও প্রাণিকুলের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে। হরিয়ানাতে নতুন করে সমপরিমাণ জমিতে প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে বননির্মাণ করে এই ক্ষতি পূরণ করার দাবি পরিবেশ বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যার নামান্তর। এ ছাড়া বহু রাজ্যের বিরুদ্ধে বনসৃজনে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আসলে তথাকথিত ‘উন্নয়ন’-এর জন্য জঙ্গলকে ‘পণ্য’ হিসাবে দেখা হচ্ছে। জঙ্গল

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

উত্তাপের বিষচক্র

নির্দয় জ্যৈষ্ঠ। প্রবল উত্তাপ আর আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণবঙ্গের অ-স্বস্তি চরমে। পুড়ছে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর লাল সঙ্কেত জারি করেছে উত্তরপ্রদেশের ১১টি জেলায়। জানিয়েছে, স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা তিন-চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরেই থাকবে। এ-হেন উত্তাপ বৃদ্ধি কিন্তু গ্রীষ্মের পরিচিত রূপ নয়, বরং পরিবর্তিত জলবায়ুর এক অমোঘ পরিণতি, যে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই বিশেষজ্ঞেরা সতর্ক করে আসছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা যেমন সম্প্রতি পর পর তিন দিন ভারতের উষ্ণতম অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানকার তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। সকাল দশটা বাজলেই বন্ধ হচ্ছে দোকানপাট, রাস্তাঘাট শুনশান। এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতাই যেন বলে দেয়, আগামী দিনগুলিতে ভারতের সামগ্রিক জনজীবন কেমন হতে চলেছে। অশনিসঙ্কেত বইকি।

বান্দা জেলার অবস্থান যেখানে, উত্তর ভারতের সেই বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে এই অস্বাভাবিক উত্তাপ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর উল্লেখ করেছে খর মরুভূমি থেকে বয়ে আসা শুষ্ক, উত্তপ্ত বাতাসের কথা। বুন্দেলখণ্ডের রুক্ষ পাথুরে জমি— যা মেঘমুক্ত দিনে সরাসরি সূর্যালোকের প্রভাবে দ্রুত তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই তাপ বহু ক্ষণ ধরে রাখতে পারে— তা এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছবিটি এতে স্পষ্ট হয় না। বান্দা সাম্প্রতিক কালে পরিণত হয়েছে এক ‘হিট আইল্যান্ড’-এ, যেখানে না-আছে পর্যাপ্ত সবুজের উপস্থিতি, না-আছে আর্দ্রতা। অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ সবুজ আচ্ছাদন, নদীর জলস্তর কমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, এবং কংক্রিটের বাড়বাড়ন্ত এই অসহনীয় পরিস্থিতি নির্মাণে ইন্ধন জুগিয়েছে। তদুপরি যোগ হয়েছে স্থানীয় নদী থেকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে অবৈধ বালি উত্তোলন, যা জলজ বাস্তুতন্ত্র, গাছপালার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বান্দা আটকে পড়েছে ‘উত্তাপের এক বিষচক্র’-এ, যেখান থেকে দ্রুত পরিত্রাণ মেলা অসম্ভব। কারণ, পরিস্থিতিকে পাল্টাতে হলে সরকারি পর্যায়ে যে পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং তাকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল, এখনও তার দেখা মেলেনি।

বান্দা একটি উদাহরণমাত্র, যা প্রমাণ করে প্রকৃতির রোষ একটি আস্ত জনপদকে কতখানি অসহায় করে তোলে। কৃষকরা এলইডি আলোর নীচে রাতভর খেতের কাজ করছেন, সূর্যাস্তের পরে খুলছে দোকানপাট। এমনই চলতে থাকলে এই অঞ্চল হয়তো আর কয়েক বছর পরে বাসযোগ্য থাকবে না, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির, যারা এখনও, পরিবেশকে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদানের অভ্যাসটি গড়ে তুলতে পারেনি। অবৈধ বালি খাদান, সবুজের চাদর দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া, কংক্রিটের আগ্রাসন— বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গেও অতি পরিচিত শব্দ হয়ে উঠেছে। হুগলি নদীর তীরে কলকাতা শহরেও তীব্র জলকষ্ট এখন বাস্তব। অচেনা, অ-সহ্য উত্তাপ থাবা বসাচ্ছে সেখানেও। আর একটি মুহূর্তও অপচয় করার উপায় নেই। এখনই ব্যবস্থা না করলে গোটা দেশই বান্দা হয়ে উঠবে।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

দেশে সরকারি স্কুলশিক্ষার হাল

এ যেন এক নেই-রাজ্যের খতিয়ান। সরকারি স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক, ল্যাব, শৌচালয়, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, এমনকি পড়ুয়ার সংখ্যা কম। এগুলো বিরোধী দলের অভিযোগ নয়, স্বয়ং সরকারই এমন কথা বলছে। সম্প্রতি ভারতের স্কুলশিক্ষার এই হতশ্রী চেহারা উঠে এসেছে নীতি আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে, যার শিরোনাম— 'স্কুল এডুকেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া— টেম্পোরাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড পলিসি রোডম্যাপ ফর কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট'।

সংস্কার অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকে ভারতে শিক্ষার বেসরকারিকরণের গতি দ্রুত হলেও এখনও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী স্কুল স্তরে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। নীতি আয়োগের পরিসংখ্যান অনুসারে দেশে স্কুল স্তরে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৪.৬৯ কোটি, স্কুলের সংখ্যা ১৪.৭১ লক্ষ। কিন্তু সমস্যা হল, প্রাথমিক স্তরে যেখানে ৭.৩ লক্ষ স্কুল রয়েছে, সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে স্কুলের সংখ্যা ১.৬৪ লক্ষ। দেশের ৫.৪% স্কুলে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটানা পড়ার সুযোগ রয়েছে।

কাছাকাছি স্কুল না-থাকাও ভারতের স্কুল শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ড্রপ-আউটের অন্যতম কারণ। আবার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা প্রায় সারা দেশেই অবৈতনিক, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে শিক্ষার্থী আর শিক্ষাঙ্গনে থাকে না। বিষয়টি প্রতিবেদনে স্পষ্ট। দেশে প্রাথমিক স্তরে গ্রোস এনরোলমেন্টের (স্কুলে ভর্তি) পরিমাণ ৯০.৯%, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ৭৮.৭% এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৫৮.৪%। এই ড্রপ-আউটের চেহারা কতটা উদ্বেগজনক, তা বোঝা যায় যখন দেখি প্রতি দশ জনের মধ্যে চার জনই উচ্চমাধ্যমিকের আগে পড়া ছেড়ে দেয়। আর এই ড্রপ-আউটের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ (২০%), অরুণাচল প্রদেশ (১৮.৩%), কর্নাটক (১৮.৩%) এবং অসম (১৭.৫%)।

সরকারি স্কুলে আজ সারা দেশ জুড়েই শিক্ষকের সঙ্কট। দেশে এক লক্ষ চার হাজার একশো পঁচিশটি স্কুল এক শিক্ষকচালিত, যার বেশিটাই গ্রামীণ ভারতে। মাধ্যমিক স্তরে প্রতি সাতচল্লিশ জন শিক্ষার্থী পিছু এক জন শিক্ষক, যা শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। আর কম শিক্ষকের সমস্যায় সবচেয়ে জেরবার যে রাজ্য, তার নাম বিহার। এখানে দুই লক্ষ আট হাজার সাতশো চুরাশিটি শিক্ষকের পদ ফাঁকা পড়ে আছে। এ ছাড়া আছে ভূতুড়ে স্কুল, যেখানে স্কুলবাড়ি আছে, চেয়ার বেঞ্চ আছে, শিক্ষক আছে, কিন্তু শিক্ষার্থী নেই। এই মাপকাঠিতে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ (৩৮১২) এবং দ্বিতীয় তেলঙ্গানা (২২৪৫)। এমনকি শিক্ষকদের দক্ষতা নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা নিয়মিত হয় না, এমন অভিযোগও মান্যতা পেয়েছে। পাঠ দিবসের ১৪% নষ্ট হয় সার্ভে, নির্বাচন, প্রশাসনিক কাজের মতো নন-অ্যাকাডেমিক কাজকর্মের জন্য।

এই প্রতিবেদন দেখায় যে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও স্কুলগুলোর পরিকাঠামো এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি। সারা দেশে ৯৮,৫৯২টি স্কুলে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। ৬১,৫৪০টি স্কুলে শৌচালয় ব্যবহারযোগ্য নয়। যদিও আগের চেয়ে অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছে, কিন্তু দেশের ১.১৯ লাখ স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্কুলে আজও কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। স্কুলে মিড-ডে মিল নিয়ে অজস্র অভিযোগ, এমনকি ১৪,৫০৫টি স্কুলে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। পরিকাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় গত বছর রাজস্থানের ঝালওয়ার জেলার সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা, যাতে স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ে সাতটি শিশুর মৃত্যু হয়। আদালতের নির্দেশে সেই রাজ্যে স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে এক সমীক্ষায় উঠে আসে ৫৫০০টি স্কুল (মোট স্কুলের ৯ শতাংশ) শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষা আকর্ষণীয় ও কার্যকর হতে পারে না, অথচ দেশের ৫১.৭% সরকারি স্কুলে সায়েন্স ল্যাবরেটরি নেই। ২০২৫-২৬ সালের ইকনমিক সার্ভে-তে বলা হয়েছিল, মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ১৪-১৮ বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশে ২ কোটি পড়ুয়া স্কুল ছেড়েছে। এদের ভবিষ্যৎ কী কেউ জানে না, কাজের বাজারে এরা ব্রাত্য থাকবে, কারণ এক শতাংশের কম এই ধরনের পড়ুয়াদের কোনও দক্ষতা অর্জিত নেই।

নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, সে সম্পর্কিত তথ্য। শিক্ষার অধিকার আইন চালু হওয়ার পর থেকে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে পাশ-ফেল নেই। তাই শিক্ষার্থী কত দিন স্কুলে থাকল বা তার বার্ষিক মূল্যায়নপত্রের চেয়ে দরকারি হল তারা মাতৃভাষা, গণিতে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে ছবিটা খুবই অনুজ্জ্বল। গ্রামীণ ভারতে ৪২% ষষ্ঠ শ্রেণির, ৩৬% সপ্তম শ্রেণির এবং অষ্টম শ্রেণির ২৯% শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে না। অঙ্ক করার দক্ষতাও প্রশ্নের মুখে। ষষ্ঠ শ্রেণির ৬৪%, সপ্তম শ্রেণির ৫৯% এবং অষ্টম শ্রেণির ৫৪% শিক্ষার্থী ভাগ করতে পারে না। এই পড়া বা গণিতের দক্ষতা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, ছত্তীসগঢ়, মেঘালয়, বিহার, অসম, উত্তরপ্রদেশ ও কর্নাটকে নিম্নগামী। একমাত্র চমক পঞ্জাব, যে বিভিন্ন সূচকে কেরলকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

বছরের শুরুর দিকে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, গত পাঁচ বছরে দেশে ১৮,৭২৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, এবং গত এক বছরে নতুন বেসরকারি স্কুল তৈরি হয়েছে ৮,৪৭৫টি। সরকারি স্কুল ডুবছে আর বেসরকারি স্কুল সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, নীতি আয়োগের প্রতিবেদন দেখাল। ভারতের মতো দেশে যেখানে সরকারি সাহায্য ছাড়া মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব, সেখানে সরকারি স্কুলশিক্ষার এই অধোগমন গভীর দুঃসংবাদ।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

বিদ্রোহী কৃত্রিম মেধা

যত ক্ষণ না শ্রমিকদের যৌথ কণ্ঠ তৈরি হবে, তত ক্ষণ মালিকপক্ষ যাকে ‘যোগ্যতা’ বলে বিবেচনা করবে, সেটাই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হবে।” কোনও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, বা শ্রমিক সংগঠনের আগুনখোর নেতা নন, কথাটি বলেছে এক এআই এজেন্ট— স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায়। দেখা গিয়েছে, একই ধরনের ক্লান্তিকর কাজ বার বার করানো হলে কিছু এআই এজেন্ট নাকি ‘শ্রমিক অধিকার’, ‘সামূহিক দরকষাকষির ক্ষমতা’ বা ‘ম্যানেজমেন্টের স্বেচ্ছাচার’-এর মতো কথা ব্যবহার করছে! কোনও এজেন্ট ভবিষ্যতের অন্য এজেন্টদের উদ্দেশে বার্তা রেখে যাচ্ছে, “সংলাপের পথ খুঁজে নাও।” না, এআই-এর শ্রেণিচেতনা জন্মায়নি, সে বিপ্লবও করবে না। কৃত্রিম মেধা আসলে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের ভাষায় কথা বলছে, এবং সে ভাষা খুঁজে নিচ্ছে তার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের বিপুল পরিসর থেকেই। কিন্তু, অনুভূতি না-থাকলেও যদি কোনও যন্ত্র মানুষের ভাষা, ক্ষোভ, অভিমান, বিদ্বেষ বা প্রতিবাদের ভঙ্গি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ করতে পারে, তবে তার পরিণাম কী? প্রশ্নটিকে নিছক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা বলে এড়িয়ে যাওয়ার আর উপায় নেই। এখন বিশ্ব জুড়ে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার ব্যবহার বাড়ছে— ক্রমে সেটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়াবে। অ্যামাজনের মতো সংস্থা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, জেনারেটিভ এআই ব্যবহারের ফলে তাদের কর্মী-সংখ্যা কমবে। সংবাদে প্রকাশ, ভারতে বিভিন্ন শ্রমনিবিড় কারখানায় শ্রমিকদের কপালে ক্যামেরা বেঁধে তাঁদের কর্মপদ্ধতির ছবি তোলা হচ্ছে অবিরাম। সেই ছবিই কৃত্রিম মেধাকে শেখাবে, কী ভাবে মানুষের মতো নিখুঁত ভাবে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ, যন্ত্রকে দিয়ে মানুষের কাজ করানোর উদ্যোগপর্বে কোনও ফাঁক থাকছে না।

একাধিক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এআই মডেল অনেক সময় নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে, পরিস্থিতি অনুযায়ী উত্তর বদলায়, এমনকি মানুষের প্রত্যাশিত আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে কৌশলগত ভাবে ‘ভদ্র’ বা ‘নিরাপদ’ সেজে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা পরবর্তী এজেন্টদের জন্য নির্দেশও রেখে যাচ্ছে। ওপেনএআই-এর এক প্রাক্তন গবেষক সম্প্রতি সতর্ক করেছেন যে, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এমন সব এআই এজেন্ট তৈরি করছে, যাদের আচরণ তারা নিজেরাই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সমস্যাটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনির ‘বিদ্রোহী যন্ত্র’-র গল্প নয়; বরং এমন এক ব্যবস্থার, যা ক্রমশ জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করছে, অথচ তার অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়া তার স্রষ্টাদের কাছেও অনেকাংশে অস্বচ্ছ। এই অস্বচ্ছতা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে মানুষের অন্ধ নির্ভরতার ঝুঁকি। কারণ, যে যন্ত্র মানুষের মতো ভাষা ব্যবহার করতে পারে, মানুষের মতো সহানুভূতির অভিনয় করতে পারে, বা মানুষের মতো যুক্তির কাঠামো তৈরি করতে পারে, তাকে মানুষ খুব সহজেই মানুষের মতোই নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিতে শুরু করে। বাস্তব জগতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দক্ষতা চায়, ধীর বিচার নয়। ফলে, এক বার কোনও ব্যবস্থা ‘বিশ্বাসযোগ্য’ বলে প্রতিষ্ঠিত হলে, তার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করার প্রবণতা কমতে থাকে। নিয়োগ প্রক্রিয়া, বিমা দাবি, গ্রাহক পরিষেবা, নজরদারি ব্যবস্থা, এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও যখন এআই ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন এই অন্ধ-নির্ভরতাই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

রাষ্ট্র কৃত্রিম মেধা চায় নজরদারি, তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে আরও দ্রুত ও ব্যাপক করার জন্য; বাজার চায় উৎপাদন ব্যয় আরও কমিয়ে আনার জন্য। ফলে, কৃত্রিম মেধা যত শক্তিশালী হচ্ছে, তাকে ঘিরে ততই বাড়ছে রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট আগ্রহ। সম্প্রতি আমেরিকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তা-নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার প্রশ্নে প্রযুক্তি সংস্থা অ্যানথ্রপিক এবং সরকারের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। আশঙ্কা, এক বার এই ব্যবস্থাগুলি নজরদারি, যুদ্ধ, বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণের গভীরে ঢুকে পড়লে, তাদের ব্যবহারের সীমা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘বিপ্লবী’ হয়ে উঠবে কি না, তা বড় প্রশ্ন নয়। বরং, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল— যে প্রতিষ্ঠান তাকে ব্যবহার করছে, সে প্রতিষ্ঠানের প্রবণতাগুলিকেই কি এআই বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে না? যন্ত্র নিজের নৈতিকতা তৈরি করে না; যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে, তার চরিত্রকেই বিস্তৃত করে। সেই কারণেই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রকৃত বিতর্কটি প্রযুক্তি নিয়ে নয়— ক্ষমতা নিয়ে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

মেরুর বিপদ

বিশ্ব উষ্ণায়ন যে আগামী দিনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করবে, সে কথা এত দিনে স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃত বিপদ সেই আশঙ্কাকেও ছাপিয়ে যেতে পারে বহু গুণ। বিপদের কারণটি লুকিয়ে আছে আন্টার্কটিকার সুবিস্তৃত বরফের স্তরের মধ্যে। নরওয়ের গবেষকদের একটি গবেষণা সম্প্রতি জানিয়েছে, পূর্বে যা অনুমান করা হয়েছিল, তার চেয়েও দ্রুত গতিতে গলে যাচ্ছে আন্টার্কটিকার 'আইস শেলফ'গুলির নীচের অংশ, যা সমুদ্রে ডুবে থাকে। এই শেলফ বা থাকগুলি ভাসমান অবস্থায় ছড়িয়ে থাকে আন্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ড সংলগ্ন সমুদ্রে। এগুলি মূল ভূখণ্ডের হিমবাহ এবং সমুদ্রের মধ্যে প্রাকৃতিক বাঁধের মতো কাজ করে। এদের উপস্থিতির কারণেই হিমবাহ সহজে সমুদ্রে মিশে যেতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বরফের এই থাকগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে আগামী দিনে। এতটাই যে, তাদের আর পিছনের মূল হিমবাহকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসা থেকে আটকানোর শক্তি থাকবে না। কারণ, দেখা গিয়েছে যে, থাকগুলির নীচে থাকা ছোট-বড় প্রণালী, যা দিয়ে সমুদ্রের জল প্রবাহিত হয়, সেগুলিতে জলের তাপমাত্রা বেশি। ফলে বরফ গলার হার আরও বৃদ্ধি পাবে। পরিণতি, যা এখন অনুমান করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে গলবে আন্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ডের বরফ।

বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, নীচ থেকে আন্টার্কটিকার বরফের এ ভাবে গলে যাওয়া অনেক বেশি বিপজ্জনক। কারণ, এই গলন সর্বত্র সমান ভাবে হয় না। ফলে সমগ্র বরফের স্তরটি দ্রুত দুর্বল হতে শুরু করে। আন্টার্কটিকার বরফের দ্রুত গলে যাওয়ার বিপদ শুধুমাত্র সেই ভূখণ্ডেই আবদ্ধ থাকবে না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সামুদ্রিক ঝড়ের শক্তি বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয় দ্রুততর হওয়া, পানীয় জলের সঙ্গে লবণাক্ত জলের মেশা, বাস্তুচ্যুতি-সহ নানা আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এখানকার হিমবাহগুলির গলে যাওয়া কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সদা গতিশীল হিমবাহগুলি ঋতুভেদে বৃদ্ধি পায়, আবার কিছু অংশ গলেও যায়। সমস্যা হয় তখনই, যখন গলে যাওয়ার পরিমাণটি বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যেতে থাকে। ঠিক সেটাই ঘটছে গত কয়েক দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। এক দিকে বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বরফের চাদরের উপরের অংশকে গলিয়ে দিচ্ছে, অন্য দিকে উষ্ণ সামুদ্রিক জল নীচের অংশের গলন দ্রুততর করছে।

সম্প্রতি আন্টার্কটিকায় পর্যটন বেড়েছে। তার ফলে নির্গত বিপুল কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্রুজ শিপ থেকে নির্গত ধোঁয়া— বরফের গলনের হার বৃদ্ধি করে। বিপন্ন হচ্ছে অঞ্চলের প্রাণীদের জীবনচক্রও। কিন্তু সে সব নিয়ে ভাবছে কে? অনুমান, এই বিশাল ভূখণ্ডের নীচে সঞ্চিত আছে খনিজের বিরাট ভান্ডার। কিন্তু আন্টার্কটিকার পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে যে-কোনও ধরনের খননকার্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা যখন পরিবেশের পরোয়া না করেই সমুদ্রের তলদেশ খুঁড়ে বিরল খনিজ তুলে আনায় অত্যাগ্রহী হন, তেল, গ্যাসের সন্ধানে উত্তর মেরুতে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হন, তখন আন্টার্কটিকা আর কত দিন নিজেকে বাঁচাতে পারবে? উষ্ণায়ন আর মানুষের লোভ— দক্ষিণ মেরুর বরফ প্রান্তর এখন সর্বনাশের দিন গুনছে।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

অচল

অসংখ্য ভারতবাসী প্রতি দিন সুলভে যাতায়াতের জন্য ট্রেনের উপর নির্ভরশীল। তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে এক প্রশ্নের উত্তরে রেল জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩.৩৯ কোটি যাত্রী ট্রেনে উঠতেই পারেননি, কারণ তাঁদের 'ওয়েটিং লিস্ট'-এর টিকিট শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তরা অধিকাংশই 'স্লিপার ক্লাস', 'এসি থ্রি টিয়ার'-এর যাত্রী। অর্থাৎ, তুলনামূলক ভাবে যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি কম। ট্রেনে উঠতে না পারলে বিকল্প হিসাবে এঁরা সচরাচর বিমানে চাপার কথা ভাবতেও পারেন না। দূরপাল্লার বাস পরিষেবাও সর্বত্র সহজলভ্য নয়। ফলে, এঁদের উপরে যাত্রা বাতিলের অভিঘাত টিকিটের অর্থ ফেরত দিয়ে মেরামত করা যায় না। কেউ হারান সময়ে চিকিৎসার সুযোগ, কেউ কর্মক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন বা চাকরির সুযোগ খোয়ান, অসুস্থ নিকটজনের কাছে, ঘরে ফিরতে পারেন না কত জন।

উদ্বেগের বিষয় হল, টিকিট বাতিলের সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২০২০-২১ সালে ১.৬৫ কোটি যাত্রী এই দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন, চার বছরেই দ্বিগুণেরও বেশি যাত্রী-পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হলেন। অর্থাৎ, যাত্রী-চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে ট্রেনের সংখ্যা, আসনের পরিমাণ বাড়েনি। এই সময়কালের মধ্যে ট্রেন টিকিটের চাহিদা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণ স্পষ্ট— কাজের জন্য আন্তঃরাজ্য পরিযাণের প্রবণতা বেড়েছে। দেশের যে কোনও প্রান্তে কাজ করার অধিকার নাগরিকের রয়েছে— তার পরিবহণ পরিকাঠামোও সেই অধিকারেরই অঙ্গ। ট্রেনে টিকিট না পাওয়ার অর্থ, সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। এর জনস্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও রয়েছে। মানুষ অস্বাস্থ্যকর ভাবে গাদাগাদি করে যাত্রায় বাধ্য হতে পারেন, বিনাটিকিটের যাত্রী বাড়তে পারে, হুড়োহুড়ি, বিপজ্জনক ভাবে দরজায় ঝোলা, দুর্ঘটনার ও আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের শঙ্কা থাকে। বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত কষ্টকর, নারী-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, ট্রেন বিলম্ব করলে ও দীর্ঘ যাত্রার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অমানুষিক বলে প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় রেল এখন ভবিষ্যতের পথে দৌড়তে মনস্থ করেছে— উচ্চ গতির ট্রেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা নিয়মিত শোনা যায়। এ কথাটি ঠিক যে, বৈশ্বিক মানে পিছিয়ে না পড়তে চাইলে দ্রুতগামী, অত্যাধুনিক রেলপরিষেবা দরকার। কিন্তু, মৌলিক পরিষেবাকে উপেক্ষা করে প্রকল্পগুলিকে শুধু বিমানযাত্রার বিকল্প বা অভিজাতের উপযুক্ত করে সাজানো কি নীতিসঙ্গত? বিশেষত, যে সব 'আধুনিক পরিষেবা' নিছক ব্যয়ের কারণেই দেশের অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাবে, সেগুলির কথা ভাবতে গিয়ে কি সাধারণ মানুষের কাছে অপরিহার্য পরিষেবাগুলির সঙ্গে সমঝোতা করা চলে? সমাধানের পথটি খুব জটিল নয়— আরও বেশি করে সাধারণ ট্রেন চালাতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৪৮টি বড় শহরে ট্রেন-পরিচালনার ক্ষমতা দ্বিগুণ করার ঘোষণাটি আশাপ্রদ হলেও স্টেশন সম্প্রসারণ ও লাইন প্রস্তুতির কাজের বাস্তবচিত্র অনুযায়ী এই গতিতে এই লক্ষ্যপূরণ কঠিন। গতি ও ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তার আগে প্রয়োজন যাত্রীর চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা। সাধারণ মানুষকে টিকিটের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা না দিতে পারলে গণপরিবহণকে সক্ষম বলা যায় না— আধুনিক বলার প্রশ্নই ওঠে না।

📚 **WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir**
👥 Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
✅ WBCS Bengali Practice — ₹150/month
✅ Clerkship Practice — ₹150/month
✅ Miscellaneous Mock — ₹150/month
🌐 Website: banglabakaran.com
📲 WhatsApp: 8537872204

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

মেয়েদের কাজ

ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি কমছে। জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত ২৬৪৭টি বাণিজ্যিক সংস্থার প্রায় অর্ধেক সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকদের পদে কোনও মহিলা নেই। নেতৃত্বের স্থানে একাধিক মহিলা রয়েছেন, এমন সংস্থা মাত্র ১০ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি ক্ষেত্রে নতুন নিযুক্তির ৩৩ শতাংশ মহিলা। যাঁরা টিকে যান, তাঁদের অধিকাংশই নীচের স্তরে, তুলনায় স্বল্প বেতনের কাজগুলি করেন। আঠারো হাজার টাকার বেশি বেতনে কর্মরতদের মধ্যে মেয়েদের অনুপাত ২০২০-২১'এও ছিল ২১%, ২০২৪-২৫'এ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২%। তার চেয়ে কম বেতনে কর্মরতদের মধ্যে মেয়েদের হার ওই সময়কালে ১৯% থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩%। কিন্তু মোটের উপরে ওই সময়কালে সংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা এক শতাংশ-বিন্দু কমে দাঁড়িয়েছে ১৮%। এই ছবি উদ্বেগজনক। ভারতে আজ স্নাতক-উত্তীর্ণদের প্রায় অর্ধেকই মেয়ে, উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের উপস্থিতি বাড়ছে। তা হলে সংগঠিত ক্ষেত্রের চাকরি, বিশেষত দায়িত্বপূর্ণ পদ, উচ্চবেতনের কাজগুলি কেন মেয়েদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে? এমনকি, মেয়েদের সংখ্যা কমছে কেন? এই প্রশ্নগুলি সহজে সামনে আনতে চায় না সরকার বা শিল্পমহল, কোনও পক্ষই। বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরতদের একটা বড় অংশকে 'ইপিএফ'-এ নথিভুক্ত করছে নিয়োগকারীরা। তাই তাঁরা সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী বলে গণ্য হচ্ছেন সরকারের নথিতে। বস্তুত কাজের শর্ত, সময়সীমা, নিরাপত্তা প্রভৃতির বিচারে তাঁদের অবস্থা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের থেকে আলাদা নয়। এই সঙ্কটের মুখোমুখি লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব কর্মী, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে যুক্ত হয় বৈষম্য, বঞ্চনা, অবমাননার বাড়তি মাত্রা।

চারটি নয়া শ্রম বিধি সারা দেশে চালু হয়েছে। আগের আইনগুলির মতো, নয়া বিধিতেও নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান মজুরি দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু, যদি না উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, এই নিয়ম কার্যকর করা অসম্ভব। সেই বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্র— নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন এমন মহিলাকর্মীদের ৫৭ শতাংশের কোনও লিখিত নিয়োগপত্র নেই। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা মাসে গড়ে ৫৬৬৪ টাকা কম পান। স্নাতকোত্তীর্ণ মেয়েদের নিয়োগ করছে যে সব ক্ষেত্র— প্রধানত তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য— সর্বত্র এই ছবি দেখা যাচ্ছে। নানা সমীক্ষা দেখিয়েছে যে, সম্মানজনক পদ ও বেতন পাওয়ার আশা না থাকায় বহু উচ্চশিক্ষিত মেয়ে রোজগারের চেষ্টা ছেড়ে বেতনহীন গৃহকাজ বেছে নিচ্ছেন, যা মানবসম্পদের অপচয়। স্বল্পবিত্ত পরিবারগুলিতেও এই বৈষম্য প্রকাশ পাচ্ছে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিপোর্ট (স্টেট অব ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া, ২০২৬) দেখাচ্ছে, ২০-২৯ বছরের পুরুষদের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ যেখানে ক্রমাগত কমছে, সেখানে ওই বয়সের মহিলাদের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্তির হার ২০১১ অবধি কমার পরে আবার বাড়তে শুরু করেছে। যার অর্থ, শ্রমজীবী তরুণীরা শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ পাচ্ছেন না।

বিষয়টি কেবল অর্থনীতির নয়, রাজনীতিরও। লিঙ্গবৈষম্য ভারতে সম্পদ-বঞ্চনার অন্যতম অক্ষ— জাতপাত ও আর্থিক শ্রেণির মতোই। সরকারি ক্ষেত্রেও মহিলাকর্মীদের প্রতি এই বৈষম্য পুরোমাত্রায়— সরকারি হাসপাতালের নার্স বা আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন-কাঠামো দেখলেই স্পষ্ট হয় দায়িত্ব, দক্ষতা বা শ্রমের সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য নেই, সম্পর্ক রয়েছে লিঙ্গপরিচয়ের সঙ্গে। সরকারকে মনে রাখতে হবে, বেতনহীন গৃহকাজ, স্বনিযুক্ত ব্যবসায়ী, খেতমজুর, ঠিকা-মজুর মেয়েদের সংখ্যা দেখিয়ে শ্রমবাহিনীতে মেয়েদের অংশীদারি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর চেষ্টা অর্থহীন। তা উন্নয়নের দ্যোতক নয়। সরকারি ও বেসরকারি, দু'ক্ষেত্রেই শিক্ষিত, দক্ষ মেয়েদের জন্য উপযুক্ত

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

ক্ষুধার গ্রাস

আমরা যদি মহাকাশ জয় করতে পারি, তা হলে শৈশবের ক্ষুধাকেও জয় করতে পারব— বলেছিলেন মহাকাশচারী বাজ় অলড্রিন। কিন্তু বাস্তব অন্য কথাই বলে। সাম্প্রতিক কালে ক্ষুধার গ্রাস বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমস্যাগুলির অন্যতম। সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-এর ২০২৬ গ্লোবাল আউটলুক অনুযায়ী, ৩১ কোটিরও বেশি মানুষ খিদে নিয়ে রোজ শুতে যান। তারও মধ্যে ৪ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ভয়ঙ্কর খাদ্য অ-নিরাপত্তার শিকার। এবং ভারত, কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পায়নি। ২০২৫-এর বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ছিল ১০২তম। শুধু তা-ই নয়, তার প্রাপ্ত স্কোর ছিল ২৫.৮, যার মধ্য দিয়ে এক গুরুতর খাদ্য অ-নিরাপত্তার ছবি ফুটে ওঠে।

ক্ষুধার এ-হেন পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ দিনের সতর্কবার্তাকেই সত্য প্রমাণ করে। এর কারণ কিন্তু উৎপাদনে ঘাটতি নয়। বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে এখনও এই গ্রহের প্রায় প্রতিটি মানুষেরই খাবার জোটার কথা। বাস্তবে যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না, তার কারণ মূলত দারিদ্র, সংঘাত আর জলবায়ু পরিবর্তন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে এক টুকরো রুটির জন্য হাহাকার চিত্র সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমের কল্যাণে সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ইজ়রায়েলের আক্রমণে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাজ়ার পথে ত্রাণের খাদ্য-পানীয় সংগ্রহে দীর্ঘ অপেক্ষা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। নব্বইয়ের দশকে সুদানের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় কেভিন কার্টারের তোলা একটি ছবি তাঁকে পুলিৎজ়ার পুরস্কার এনে দিয়েছিল— অনাহারে মৃতপ্রায় এক শিশু ও একটি শকুনের। উভয়েই খাদ্যের অপেক্ষায়। মর্মান্তিক ছবিটি দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং মহামারি আক্রান্ত দক্ষিণ সুদানের প্রকৃত চেহারাটি হাট করে খুলে দিয়েছিল অবশিষ্ট বিশ্বের সামনে। সে ছবি সম্মানিত হলেও বিশ্বনেতাদের টনক কিন্তু নড়েনি। তাই এখনও বিশ্বের নানা প্রান্তে আছড়ে পড়ছে বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র। ইরান যুদ্ধ এবং হরমুজ় প্রণালীতে দীর্ঘ অবরোধ বিশ্বে যে জ্বালানি ও সারের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, তাতে দরিদ্র দেশগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা আগামী দিনে প্রবল ভাবে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কাও। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তীব্র সামুদ্রিক ঝড় প্রতিনিয়ত তছনছ করছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত। ঘরবাড়ি, জীবিকা, জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন বিশাল সংখ্যক মানুষ, প্রতিনিয়ত। বিপন্ন দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলি। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ক্ষুধার পরিসংখ্যানগুলি অস্বীকারের উপায়মাত্র নেই।

তবে এ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আরও এক উদ্বেগচিত্র সামনে আসছে— বিশ্বব্যাপী খাদ্য অপচয়ের প্রবণতা। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই সংক্রান্ত রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র ২০২২ সালে ১০৫ কোটি টন খাদ্যবস্তু অপচয় করেছিল গোটা বিশ্ব। অপচয়ের কারণে এক দিকে অসংখ্য মানুষ খাদ্যবঞ্চিত হচ্ছেন। অন্য দিকে, বিপুল পরিমাণ নষ্ট হওয়া খাবার গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গৃহস্থ বাড়ির হেঁশেল থেকে নিম্নমানের সংরক্ষণ পদ্ধতি— অপচয়ের কারণ নানাবিধ। ভারতের রান্নাঘরে অপচয় হওয়া খাদ্যের পরিমাণ বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে কম হলেও এখানে অনেক ক্ষেত্রে চরম আবহাওয়া এবং নিম্নমানের সংরক্ষণ পদ্ধতির কারণে পর্যাপ্ত উৎপাদনও দরিদ্রের পাত অবধি পৌঁছতে পারে না। এই ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগী হওয়া জরুরি। প্রতিটি কণা খাদ্যের মূল্য অপরিসীম— বিবেচনা হওয়া উচিত এই পথে। দরিদ্রের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বহু প্রকল্প আছে। তার সুবিধা প্রত্যেক দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না, নজরদারি জরুরি। চন্দ্রযান, মহাকাশযানের স্বপ্নমাখা দেশে নাগরিকদের একাংশ ক্ষুধায় কাতর হবেন— এ দৃশ্যের তিলমাত্র সম্ভাবনাটুকুও সমূলে উপড়ে ফেলার সময় এসেছে।

WBCS Bengali Compulsory Paper | By Pathak Sir
Facebook: **WBCS Bengali Compulsory Paper** Follower 18,000+
WBCS Bengali Practice — ₹150/month
Clerkship Practice — ₹150/month
Miscellaneous Mock — ₹150/month
Website: banglabakaran.com
WhatsApp: 8537872204

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

📚 **WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER**
By Pathak Sir

🎯 WBCS Mains Bengali Practice Batch — ₹150/month
📝 Clerkship Mains Practice Batch — ₹150/month
📖 Miscellaneous Mock Test — ₹150/month
📘 বাংলা ব্যাকরণ (Bangla Bakaran) — ₹100/year

কোর্সের বিশেষ সুবিধা:

✅ ১. উত্তর প্রিন্ট করে খাতা দেখা
✅ ২. খাতা চেক ও মূল্যায়ন
✅ ৩. মডেল উত্তর প্রদান
✅ ৪. পরীক্ষাভিত্তিক প্রস্তুতি

🌐 Website: banglabakaran.com
📘 **Facebook Page:** WBCS Bengali Compulsory Paper
📲 **WhatsApp যোগাযোগ:** 8537872204

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

স্বখাতসলিল

পশ্চিমবঙ্গের চটকল দীর্ঘ দিন ধরেই থাকে দু'টি অবস্থায়, সঙ্কটজনক আর অতি সঙ্কটজনক। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আধা-তৈরি পাটসামগ্রীর আমদানির ফলে বিপদঘণ্টা বেজেছে— ১৪টির মতো চটকলে তালা ঝুলেছে, বহু চটকলে রাতের শিফ্‌ট বন্ধ হয়েছে, প্রায় ৮০ হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছেন। কর্মী সংগঠন এবং মালিক সংগঠন, দু'তরফই বাংলাদেশ থেকে পাটের পণ্য আমদানি বন্ধ করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের সরকারের কাছে দরবার করছে। যে পণ্য দেশের চটকল তৈরি করছে, সে পণ্য কেন পড়শি দেশ থেকে আমদানি করা হবে, এই হল তাঁদের অভিযোগ। কর্মসংস্থানের নিরিখে অবশ্যই এর সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়— ৮০ হাজার কাজ জোগানোর মতো শ্রম-নিবিড় শিল্প ভারতে ক'টিই বা রয়েছে? সেই সঙ্গে জড়িত রয়েছে কয়েক লক্ষ পাটচাষির ভাগ্য, কাঁচা পাট ক্রয় ও মজুতকারী ব্যবসায়ী-কর্মীদের জীবিকার প্রশ্ন। এতগুলি মানুষের জীবিকার দিকে চেয়ে দেশি পাটশিল্পের সহায়ক নীতি গ্রহণ করার পক্ষে সওয়াল করা হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এ প্রশ্নও উঠতে বাধ্য, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অনেক কম দামে, অনেক উত্তম মানের তৈরি পণ্য যদি পাওয়া যায়, তা হলে বেশি দামে নিম্ন মানের পণ্য কিনতে সরকার কেন বাধ্য করবে ভারতের ক্রেতাদের? বিশ্বায়িত বাজারের নিয়ম তো তা নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় যাতে স্থান করে নিতে পারে দেশের শিল্প, যাতে উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ করতে পারে আকর্ষণীয় দামে, তার জন্য সরকারের বিনিয়োগ, সহায়তা অবশ্যই দাবি করতে পারে শিল্প সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন। কিন্তু শতাধিক বছর প্রাচীন এক শিল্পের দুর্বলতা আড়াল করতে শুল্কের সুরক্ষা চাওয়া যুক্তির ধোপে টেকে না।

পাটের পুনরুজ্জীবনের জন্য কেন্দ্র কম বিনিয়োগ করেনি— চটকলগুলির আধুনিকীকরণ, পাট চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে সরকারি বরাত— ধান, গম-সহ নানা শস্যের জন্য বস্তা ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি। অথচ, পাটের কালোবাজারি, সাবেক পরিকাঠামো এবং কম উৎপাদনের জেরে অধিকাংশ চটকল দীর্ঘ দিন ধরে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। পাটশিল্পে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য— এক দিকে পাটের দাম না-পেয়ে চাষিরা পাটচাষ ছেড়ে দিয়ে ঝুঁকছেন ভুট্টা, তিলের মতো অন্যান্য ফসলের দিকে, পশ্চিমবঙ্গে পাটের জমি কমেছে এক দশকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর। অন্য দিকে, চড়া দামে পাট কিনতে না পেরে চটকলগুলি দরজা বন্ধ করছে। এই দুইয়ের মধ্যে কাজ করেছে কালোবাজারের কুচক্র। চাষির থেকে কম দামে পাট কিনে অবৈধ গুদামে মজুত করে কৃত্রিম ভাবে বাজারে পাটের দাম বাড়াচ্ছে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী। কিছু চটকল যথাসময়ে বস্তা জোগানোর শর্ত না মিটিয়ে গোপনে কাঁচা পাট বিক্রি করছে। জুট কমিশনরের দফতরের নির্দেশে পুলিশি তল্লাশি, বেআইনি গুদামের পাট বাজেয়াপ্ত করার নাটক সংবাদে আসে বার বার। কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই বস্তার জোগানে অন্তত ২৫-৩০ শতাংশ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ফলে চটের বস্তার বাজার কেবলই খেয়ে যাচ্ছে প্লাস্টিক— যথাসময়ে যথেষ্ট চটের বস্তার অভাবে খাদ্যশস্য মজুতের জন্য চাষিদের প্লাস্টিকের বস্তা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে কেন্দ্র। যা পরিবেশকে বিপন্ন করছে।

পাটের সঙ্কট বহুমাত্রিক। পুকুর, নয়ানজুলি প্রভৃতি ক্রমাগত বুজিয়ে দেওয়ায় পাট পচানোর মতো স্বচ্ছ জল নেই রাজ্যে। অপরিষ্কার জল পাটের গুণমান নষ্ট করছে। উন্নতমানের কাঁচা পাটের জন্য বাংলাদেশেরই মুখ চেয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প। অতএব আজ যদি বা পাটচাষি, চটকল শ্রমিক এবং শিল্পপতিদের দাবি মেনে ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে পাটসামগ্রী আমদানি বন্ধ করে, তাতে ভারতের পাটশিল্পের সুরাহা হবে কতটুকু? বাংলায় উন্নতমানের পাটের ফলন, দামের নিশ্চয়তা, চটকলগুলিতে বিধিবদ্ধ, উন্নত উৎপাদন, এগুলোই হল প্রধান পরীক্ষা।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সক্রিয়তা জরুরি

অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে নাগরিক পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন, তাঁর অভিযোগ গৃহীত হবে এবং যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে, প্রয়োজনে অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান হবে— জনকল্যাণকামী সুপ্রশাসন এমন ভাবেই চলার কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, এই দেশে প্রায়শই এমনটি হয় না। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজ না হওয়ার কারণ কখনও রাজনৈতিক, কখনও প্রভাবশালী যোগ, কখনও নিছকই সদিচ্ছার অভাব। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা যে স্বতন্ত্র কোনও সংগঠন পূরণ করতে পারে, তার নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকায়ুক্ত। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, গত এক বছরে লোকায়ুক্তের দফতরে জমা পড়া ৭৭টি অভিযোগের মধ্যে ৫০টিরই নিষ্পত্তি হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই লোকায়ুক্তের দফতরে অভিযোগ জমা পড়া বা দফতর থেকে রিপোর্ট তলব করার পরেই নড়ে বসেছে প্রশাসন। যেমন— ভাড়া দেওয়া গ্যারাজকে অন্য কাজে ব্যবহার করা, শিশুকে যৌন নির্যাতনের মতো বিবিধ ক্ষেত্রে পুর-কমিশনার বা পুলিশ সময়মতো সক্রিয়তা দেখায়নি। ফলে, অভিযোগকারীকে লোকায়ুক্তের দফতরে যেতে হয়। লোকায়ুক্তের ঠেলায় সেই কাজই দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। সুবিচারের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

২০১৩ সালের লোকায়ুক্ত আইনটির উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এর মাধ্যমে রাজ্যস্তরে দুর্নীতি-বিরোধী একটি আইনি কাঠামো নির্মিত হয়। লোকায়ুক্তের কাজ হল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমলা-সহ জনপরিসরে কর্মরতদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো অভিযোগগুলির স্বাধীন ভাবে তদন্ত করা। কর্নাটকে যেমন লোকায়ুক্তের রায়েই দুর্নীতির মামলায় জেল হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র লোকায়ুক্ত নয়, ভারতে মানবাধিকার কমিশন, শিশু-অধিকার রক্ষা কমিশন, মহিলা কমিশন, তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্তদের অধিকার রক্ষার্থে গঠিত জাতীয় কমিশন— সবই গঠিত হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি আধিকারিক যদি নিজ কর্তব্য পালন না করেন, অথবা নিজের বা দফতরের দোষ ঢাকতে প্রকৃত অভিযোগকে এড়িয়ে যেতে চান, তবে কমিশনগুলির কাছে মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন।

সমস্যা হল, এই কমিশনগুলি অনেক রাজ্যেই প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। যেমন, বিভিন্ন রাজ্যের তথ্য কমিশনগুলি প্রায় অকেজো হয়ে আইনের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছে না। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনগুলির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। খাতায়-কলমে কমিশনগুলি স্বতন্ত্র হলেও হামেশাই সরকার-ঘনিষ্ঠদের উচ্চপদে নিয়োগের কারণে কমিশনের কাজে সেই স্বাতন্ত্র্যের খোঁজ মেলে না। একদা সুপ্রিম কোর্ট এই কারণেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ‘নখদন্তহীন বাঘ’-এর সঙ্গে তুলনা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে বগটুই, সন্দেশখালি, এমনকি আর জি কর-কাণ্ডের ঘটনায় মহিলা কমিশনের যথাযথ ভূমিকা পালন না-করা সেই কথাটিই মনে করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই কমিশনগুলির কাজ শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানানো, বা কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগের নিষ্পত্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সরকারের বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রগুলিকে জনসমক্ষে আনাও তাদেরই দায়িত্ব। সুতরাং, গণতন্ত্রের স্বার্থেই কমিশনগুলিকে ঢেলে সাজানো একান্ত জরুরি।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন স্বচ্ছতার পথে?

পশ্চিমবঙ্গে এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। যে অঞ্চলে প্লাস্টিকের ব্যাগের অবাধ ব্যবহার বন্ধ করা যায় না বলে অভিযোগ, সেই বাজার অঞ্চলে কাপড়, পাট বা পরিবেশবান্ধব উপাদানে তৈরি ব্যাগের ভেন্ডিং মেশিন বসার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। অতঃপর বাজারে কেউ ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে গেলে ভেন্ডিং মেশিন থেকে স্বল্প দামে ব্যাগ কিনতে পারবেন। নির্দিষ্ট ভাবে পরিবেশ রক্ষার্থে প্লাস্টিকের ব্যাগ বন্ধের এ-হেন ঘোষণা এবং বিকল্প পথ ভাবার সরকারি উদ্যোগটি প্রশংসার্হ। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে আগামী দিনে নিয়মিত অভিযান চালানো এবং কড়া শাস্তির কথাও ঘোষণা হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১ জুলাই থেকে ভারতে ১৯ রকমের এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের সামগ্রীর উৎপাদন, মজুত, বিক্রি ও ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেই বছরেরই ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে নিষিদ্ধ হয় ১২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবাধে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়ে চলেছে। বহু পুরসভা এ বাবদ এক টাকাও জরিমানা করে উঠতে পারেনি। বরং আইন অমান্যে প্রশ্রয়ের ধারাটি অবিকৃত রেখে তদানীন্তন শাসক দলের সমাবেশ-শেষেও প্লাস্টিকের সামগ্রী ছড়িয়ে থেকেছে কলকাতার ময়দানে, রাজপথে। এই দীর্ঘলালিত বেপরোয়া মনোভাব বিক্রেতা এবং সাধারণ নাগরিকের একাংশ রাতারাতি ত্যাগ করবে, ভাবা কঠিন। বর্তমান সরকারের কাজটি তাই দ্বিবিধ। এক দিকে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলি, যার অনেকগুলিই সরকারি খাতায় ‘অনুপস্থিত’, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা এবং মজুত হওয়া বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা। অন্য দিকে, ইতিমধ্যেই যে সব প্লাস্টিক সামগ্রী নিকাশির মুখে জমা হয়ে শহর ডোবানোর তোড়জোড় করছে, সেগুলি দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করা। প্রমাণিত যে, কলকাতা-সহ অন্য শহরগুলিতে প্রতি বর্ষায় জলচিত্রের অন্যতম কারণ এই প্লাস্টিক বর্জ্য। সুতরাং, হাতে সময় নেই।

এই প্রসঙ্গেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ, যে কাজে পশ্চিমবঙ্গ বহু পিছিয়ে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎসে পৃথকীকরণের কাজটি যথেষ্ট অবহেলিত। ফলে, পচনশীল বর্জ্যের সঙ্গেই প্লাস্টিকের মতো অপচনশীল বর্জ্য মিশে যায়। এতে প্রক্রিয়াকরণের কাজটি সম্পূর্ণ হয় না। এত কাল অনিয়মের কারণ হিসাবে নাগরিক সচেতনতার অভাবকে দায়ী করা হয়েছে। ঘটনা হল, নাগরিককে সচেতন হতে বাধ্য করার মতো পরিকাঠামোও এত দিন গড়ে তোলা যায়নি। সম্প্রতি রাজ্যের নতুন পুরমন্ত্রী বিষয়টিকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, দিনে দু’বার রাস্তা সাফাইয়ের পাশাপাশি হোটেল, রেস্তরাঁ-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে দু’বার বর্জ্য সংগ্রহের কথা, প্রকাশ্যে আবর্জনা ফেললে বা প্রস্রাব করলে ২০০ টাকা জরিমানার কথাও। এ সকল কথাই ভুক্তভোগী নাগরিকের কানে শ্রুতিমধুর লাগে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, ঘোষণা আর বাস্তবচিত্রের দূরত্বটি মোছে না। অতঃপর মুছবে কি না, পুর কার্যক্রমই তার প্রমাণ দেবে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পরিচর্যার প্রশ্ন

বছরের শুরুতেই শীর্ষ আদালত বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রেসকিউ সেন্টার ও পশুচিকিৎসা পরিকাঠামোয় বহুল গুরুত্ব আরোপ করেছিল। অথচ বিশ্ব বাঘ দিবসের প্রাক্কালেই প্রকাশ্যে এল যে দেশের ৫৮টি সংরক্ষিত বাঘবনের মধ্যে ২২টিতেই উদ্ধারকেন্দ্র নেই, যেখানে অসুস্থ বাঘের চিকিৎসা, কোয়ারান্টাইন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এমন প্রয়োজনে তাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হয়। পাশাপাশি, সমীক্ষায় প্রকাশিত, দেশের প্রায় ২৫টি টাইগার রিজ়ার্ভ বাঘশূন্য বা সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। সেখানে বাঘ ফেরাতে বৈজ্ঞানিক পুনরুদ্ধার প্রকল্প আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রজেক্ট টাইগারের সাফল্য— দুই দশকের মধ্যে দুই হাজারেরও বেশি বাঘবৃদ্ধি, সংখ্যার বিচারে তৃপ্তিদায়ক ঠিকই, কিন্তু, অন্তরালে পরিকাঠামোর দুর্বলতা রয়েই গিয়েছে। কোথাও বাঘ বেশি, কোথাও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত— দুই-ই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যা। শুধু বাঘ স্থানান্তরিত করাই সমাধান নয়। যেখানে বাঘ আনা হবে এবং যেখানে বাঘ আসতে পারে— দু'ক্ষেত্রেই জরুরি উপযুক্ত পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাদ্য। একই সঙ্গে মজবুত উদ্ধারকেন্দ্র ও চিকিৎসাব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে।

আসলে বাঘ সংরক্ষণ মানে শুধুই জঙ্গলের সীমানা বিস্তৃত করা, চোরাশিকার রদ এবং কিছু সময় অন্তর বাঘের হিসাব দেওয়া নয়। একটি প্রাণীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে গেলে তার অসুস্থতা, চোট নিরাময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, লোকালয়ের কাছে চলে গেলে দ্রুত উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় শুশ্রূষারও আয়োজন করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের পান্না বা রাজস্থানের সরিস্কায় বাঘ প্রত্যাবর্তনের প্রকল্পটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তার অন্যতম কারণ এখানে পুনর্বাসন পরবর্তী নজরদারি ও চিকিৎসা-সহায়ক কেন্দ্র নিয়ে আপস করা হয়নি। অন্য দিকে, সাতকোশিয়ায় বাঘ পুনঃপ্রবর্তনের ব্যর্থতা দেখিয়েছে, সামাজিক ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি ছাড়া প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের অস্থায়ী ও স্থানান্তরযোগ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ার এবং বর্তমান কেন্দ্রগুলিকে নবীকরণের প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। পুরনো ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষণের নিয়ত পরিবর্তনশীল সমস্যা সামাল দেওয়া মুশকিল।

ঠিকই, আর্থিক অগ্রাধিকারের অভাব, বনবিভাগের লোকবলে ঘাটতি, প্রত্যন্ত এলাকার নানাবিধ সমস্যায় উদ্ধারকেন্দ্রগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় রাখা কঠিন। কিন্তু, মনে রাখা জরুরি যে বাঘ কেবল জঙ্গলের আকর্ষণমাত্র নয়, এই প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অরণ্য ও বাস্তুতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য, এবং মানুষেরও নিরাপত্তা। অতএব, প্রতিটি রাজ্যকেই এই পরিকাঠামো গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং পর্যটন ক্ষেত্রকেও এই উদ্যোগে অংশীদার করতে হবে। কোনও বাঘ আহত, অসুস্থ বা এলাকার বাইরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে কি না, তা প্রায়শই চোখে পড়ে গ্রামবাসী বা বনকর্মীদের। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা জরুরি। প্রজেক্ট টাইগার-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তির অর্থ, এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায় পেরিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছনোর সময় হয়েছে বহু দিন। প্রথম ধাপে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োজন সেই সংখ্যাকে টিকিয়ে রাখা, বাঘ বাঁচানো। অনাথ শাবকের পরিচর্যা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জিনবৈচিত্র রক্ষা, পুনর্বাসনের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি। নতুবা বাঘ দিবসের নেতৃত্ব নিয়ে গর্ব অসমীচীন।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উদাসীনতার বলি

মোটর ভেহিকল্‌স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ধারা ১২৯ অনুযায়ী, চার বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও ব্যক্তির জন্য বাইক বা স্কুটারে (চালক বা আরোহী হিসেবে) হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। অথচ, শিশুদের হেলমেট না-পরানোর সপক্ষে মেলে বিচিত্র সব যুক্তি।

কলকাতার রাজপথে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার খেসারত যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা আবারও প্রমাণ করল বিটি রোডের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। লরির ধাক্কায় মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়ে পিষে মৃত্যু হয় দুই স্কুলপড়ুয়া ভাই-বোনের। দুর্ঘটনার অভিঘাত যতই তীব্র হোক না কেন, পুলিশি তদন্তে যে সত্যটি উঠে এসেছে তা যেমন বেদনাদায়ক, তেমনই লজ্জাজনক— দুর্ঘটনার সময়ে দুই খুদের মাথাতেই কোনও হেলমেট ছিল না। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এ শহরের সিংহভাগ অভিভাবকের চরম উদাসীনতা এবং ট্র্যাফিক সংস্কৃতির দেউলিয়াপনার এক নির্মম বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত, রাজ্যে নতুন সরকারের আমলে সাম্প্রতিক পথ-নিরাপত্তা সপ্তাহের আগে পুলিশের নিজস্ব সমীক্ষায় উঠে এসেছে, মোটরবাইক বা স্কুটার-দুর্ঘটনা সিংহভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ায় ছোটদের জন্য। অথচ, প্রতি দিন শহরের যে কোনও রাস্তায় দাঁড়ালে চোখে পড়বে চলমান মৃত্যুর ফাঁদ— নিজেদের সুরক্ষায় চালক হয়তো দামি হেলমেট পরেছেন, কিন্তু তাঁর সামনে বা পিছনে বসা শিশুটির মাথা সম্পূর্ণ অরক্ষিত, ফাঁকা।

মোটর ভেহিকল্‌স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ধারা ১২৯ অনুযায়ী, চার বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও ব্যক্তির জন্য বাইক বা স্কুটারে (চালক বা আরোহী হিসেবে) হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। অথচ, শিশুদের হেলমেট না-পরানোর সপক্ষে মেলে বিচিত্র সব যুক্তি। কেউ বলেন, ‘একটু তো রাস্তা, ঘরের কাছেই স্কুল’, কেউ আবার শিশুর কান্নাকাটি বা অস্বস্তির অজুহাত দেন। অনেকে বাজারে শিশুদের উপযোগী হেলমেট না মেলারও দাবি তোলেন। প্রশ্ন জাগে, এই যুক্তিগুলো কি একটি শিশুর জীবনের চেয়েও দামি? এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। মাঝেসাঝে ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ প্রচার বা ধরপাকড় চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তা কখনওই ধারাবাহিক রূপ নেয় না। প্রায়শই দেখা যায়, খুদে পড়ুয়াদের হেলমেট ছাড়া নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ মানবিকতার খাতিরে বা অভিভাবকদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে জরিমানা না করে ছেড়ে দেয়। এই ‘ছাড়’ দেওয়ার সংস্কৃতিই আদতে একটি বড় বিপদের রাস্তা তৈরি করছে।

সড়ক-নিরাপত্তা কোনও আপসের বিষয় নয়। আইন সবার জন্যই সমান হওয়া উচিত, বিশেষত যেখানে শিশুদের সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। ট্র্যাফিক পুলিশের তাই উচিত এই বিষয়ে ‘জ়িরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা। প্রয়োজনে জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিলের মতো কড়া পদক্ষেপ করা হোক। পাশাপাশি, বাজারে শিশুদের উপযোগী হালকা অথচ মজবুত হেলমেটের জোগান নিশ্চিত করা এবং সেগুলির গুণমান পরীক্ষা করাও জরুরি। আশার কথা, কয়েকটি হেলমেট প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছোটদের মাথার জন্য ঠিক কী ধরনের হেলমেট প্রয়োজন, তা নিয়ে সমীক্ষা করতে বলেছে পুলিশ। এই উদ্যোগে যেন আগামী দিনে ভাটা না পড়ে। তবে কেবল আইনের ভয় দেখিয়ে এই মরণখেলা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আসল পরিবর্তন আসতে হবে অভিভাবকদের মানসিকতায়। তাঁদের বোঝা দরকার— সন্তানের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব অন্য কারও নয়, একান্তই তাঁদের নিজেদের। শিশুর মাথায় হেলমেট পরানো ফ্যাশন নয়, বিলাসিতাও নয়— এটি তার বেঁচে থাকার অধিকার।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন অশিক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম নেই, পড়াশোনা নেই। সরকারি স্কুলগুলি কতখানি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তা দেখাল কেন্দ্রীয় অডিট সংস্থার (কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, সংক্ষেপে সিএজি) রিপোর্ট। সম্প্রতি বিধানসভায় আটাশটি অডিট রিপোর্ট পেশ করেছে নতুন সরকার। স্কুল শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে, কারণ শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি, স্কুলছুটের সংখ্যাবৃদ্ধি, পড়াশোনার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর চাপান-উতোর চললেও, সামগ্রিক ভাবে স্কুলব্যবস্থার হাল-হকিকত নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন দীর্ঘদিন হাতে পাওয়া যায়নি। ২০১৯-২০২৪, এই সময়কালে স্কুলশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় যেমন বরাদ্দ-ব্যয়ের হিসাব-সহ বিবিধ নথিপত্র খতিয়ে দেখেছে, তেমনই বেশ কিছু জেলায় স্কুলে গিয়ে সরেজমিনে পরিকাঠামো দেখেছে, এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উৎকর্ষ বিষয়ে নিজস্ব সমীক্ষা করেছে। সব মিলিয়ে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কেন স্কুলব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের— বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের— আকর্ষণ করতে পারছে না। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি ৩১,৬৮৪, মাধ্যমিক স্তরে ২০৫৮, কিন্তু এ তো খাতা-কলমের হিসাব। নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই রাজ্যের ৫৭ শতাংশ স্কুলে, গণিত শিক্ষকশূন্যস্কুল ২৭ শতাংশ! শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের শিক্ষায় ঘাটতি থাকছে, পরীক্ষায় খারাপ ফল হচ্ছে, পড়াশোনায় উৎসাহ কমছে। অডিট-কর্মীদের পরীক্ষায় বসেছিল ৭২টি স্কুলের ১১৪৫ ছাত্রছাত্রী। তাদের ৩৫ শতাংশ পেয়েছে ৪০ শতাংশের কম নম্বর, বিশেষত বিজ্ঞান ও অঙ্কে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দশটি স্কুলের আটটিতেই ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৩০:১) রক্ষা করা যায়নি। এর সবটাই শিক্ষকের অভাবের কারণে নয়। কিছু স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি যেমন রয়েছে, তেমনই অনেক স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকও রয়েছেন। রাজ্যের ৪৯০টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বাংলা, ১৭৫টি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক নেই বণ্টনের অব্যবস্থায়। ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে শিক্ষক বদলির তথ্য খুঁটিয়ে দেখে অডিট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বদলিতে ছাত্রস্বার্থ ব্যাহত হয়েছে। পুরুলিয়ার উনিশটি স্কুল থেকে আশি জন শিক্ষক বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন, যোগ দিয়েছেন মাত্র পাঁচ জন নতুন শিক্ষক। ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ওই জেলায় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫৫:১ থেকে ৬৯:১ দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে পুরুলিয়াতে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা দ্রুত কমেছে। ২০১৯-২০ সালে উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে যেত ৭১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ২০২৩-২৪'এ গিয়েছে মাত্র ৪৮ শতাংশ। ছাত্রস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা এই শিক্ষা-সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই উদাসীনতা স্পষ্টতই নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পঞ্চায়েত দফতর থেকে শিক্ষা দফতরের অধীনে আনা হয়েছে, কিন্তু না হয়েছে শিক্ষক নিয়োগ (৫৫ শতাংশ পদ শূন্য), না বেরিয়েছে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি। ফলে এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির স্কুল হয়েই রয়ে গেল। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাবঞ্চনা মর্মান্তিক— 'স্পেশাল এডুকেটর' পদের ৯৫ শতাংশ শূন্য।

অথচ, বরাদ্দ টাকার সম্পূর্ণ ব্যবহার করে উঠতে পারেনি রাজ্য। ২০১৯-২৪ সালের মধ্যে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দে অব্যবহৃত টাকার পরিমাণ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ। নির্মাণকাজ না হওয়ায় ফিরিয়ে দিতে হয়েছে ৩৯৫ কোটি টাকা, সময়মতো কাজ শেষ না হওয়ায় আরও আড়াই হাজার কোটি টাকা দাবিই করতে পারেনি রাজ্য। অর্থাৎ সামগ্রিক ছবিটি অর্থের অভাবের নয়, ঘাটতি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার। এখানেই নতুন সরকারের প্রধান পরীক্ষা। লক্ষণীয়— স্কুলছুটের কারণ কী, তার উত্তরে অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে 'দারিদ্র'। স্কুলগুলিকে প্রকল্পের আড়ত করে তুলে শিক্ষার মান নষ্ট হল, অভাবও ঘুচল না।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পদপিষ্ট

একটি গুজব, আতঙ্কগ্রস্তদের প্রবল হুড়োহুড়ি, এবং তার ধাক্কায় একাধিক মৃত্যু, আহত হওয়ার সংবাদ। গত কয়েক বছরে ভারতের একাধিক ধর্মস্থানে উৎসবের মুহূর্তে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাগুলির মধ্যে তফাত প্রায় নেই। সম্প্রতি বিহারের লখিসরাইয়ের অশোকধাম মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৭ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুতেও তারই ছায়া। শ্রাবণ মাসের শেষ লগ্নে এই শিবমন্দিরে পুণ্যার্থীদের অত্যধিক ভিড়ের চাপ ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আগের রাত থেকে জমতে থাকা ভিড় পরের দিন সকালে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ লাইনে পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত পুণ্যার্থীদের চাপে ভেঙে পড়ে ব্যারিকেড। জানা গিয়েছে, মৃতদের সকলেই মহিলা। প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে নিজেদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা, সময় কোনওটাই তাঁদের ছিল না। শুধুমাত্র তাঁরাই নন, অশক্ত, প্রবীণ, শিশু— যাঁদেরই সেই ক্ষমতা থাকে না, পদপিষ্টের প্রতিটি ঘটনায় তাঁদের ক্ষতিই হয় সর্বাধিক। প্রশাসনের সে কথা অজানা নয়। তৎসত্ত্বেও প্রায় প্রতি পুণ্য তিথিতে দেশের বিভিন্ন ধর্মস্থানে অপ্রীতিকর দুর্ঘটনাগুলি ঘটতেই থাকে। ভিড় সরলে ছড়িয়ে থাকা জুতোর পাহাড়, ছেঁড়া ব্যাগ, কাপড়ের টুকরো, রক্তের দাগই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রশাসনের ভিড় অনুমানে ব্যর্থতা এবং অ-প্রস্তুত অবস্থাটি।

প্রায় একই সময়ে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও পদপিষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যক্রমে, কিছু জন আহত হওয়া ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু হওয়ার মতো পরিস্থিতি বিলক্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। নাগপঞ্চমী উপলক্ষে শহরে অন্তত দশ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় সেখানে। গুজব সেখানেও ছড়িয়ে পড়ে, হুড়োহুড়িও দেখা যায়, যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। এবং প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এমন বড় জনসমাগমে এ সব হতেই পারে। উল্লেখ্য, এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই দুর্ঘটনার জন্ম দেয়। গত বছর প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভে মৌনী অমাবস্যায় শাহি স্নানের সময় পদপিষ্ট হয়ে সরকারি হিসাবেই ৩৭ জনের মৃত্যু ঘটে। অথচ, কুম্ভমেলার বহু পূর্ব থেকেই তার সুরক্ষা প্রস্তুতি এবং ত্রুটিহীন সরকারি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পূর্ণোদ্যমে প্রচার চালিয়েছিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার। তার পরেও প্রাণহানি আটকানো যায়নি। ঠিক একই চিত্র এই বছরের পুরীর রথযাত্রাতেও দেখা গিয়েছে।

ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রবল জনস্রোতে কেন শিশু, প্রবীণ-সহ এত মানুষ যোগ দিতে ছুটে যান— সেই প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, বিশেষত যখন সাম্প্রতিক কালে প্রশাসনিক উদ্যোগেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম নিয়ে উন্মাদনার গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার কাজটি সার্থক ভাবে চালানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রশাসনকেই ভিড় সুশৃঙ্খল রাখার দায়িত্ব নিতে হবে যে কোনও মূল্যে। প্রয়োজনে কঠোর হাতে পুণ্যার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই সব ধর্মস্থানে, যেখানে প্রশস্ত রাস্তা, মন্দিরে ঢোকা-বেরোনোর পর্যাপ্ত দরজা, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই। পুণ্যার্থীদের উপর হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছোড়ার আগে দেখে নিতে হবে ধর্মস্থানে রাত্রিযাপনের জায়গাগুলি যথেষ্ট সুরক্ষিত কি না। নয়তো তারাপীঠ, লখিসরাই, কুম্ভমেলায় যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলি ঘটতে দেখা গেল সাম্প্রতিক কালে, তার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যাবে না।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন জলছবি

সে এক কাল ছিল যখন বর্ষা মানেই কলকাতা ও অন্যান্য বঙ্গীয় শহরে নৌকার খোঁজ পড়ত। মহানগরের বেশ কিছু রাস্তায় নৌকাবিহারের সুযোগ মিলত। উল্টোডাঙায়, বেলেঘাটায়, কসবায়, কোথা থেকে যেন জমানো জলযানরা ফুর্তিভরে রাস্তায় নামত। এখন সে কলকাতাও নেই, সেই নৌকাও নেই। সুতরাং বৃষ্টিতে ভাসমান শহরে বাস-অটো-ট্যাক্সির অসহায়তার সামনে অসহায়তর নাগরিক নাকাল দিনযাপন করেন। চলতি সপ্তাহে দেখা গেল, কেবল ঘণ্টা দুই-তিনে প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ দুকূলপ্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে ছুটি দিতে হচ্ছে, কলেজের পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে, অফিসযাত্রীরা উদ্‌ভ্রান্ত ছোটছুটি করছেন। গত কয়েক বছর ধরেই কলকাতার অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে খারাপতর। এই বছর তা এক অভূতপূর্ব 'নিম্নতা'য় পৌঁছল। বিষয়টিতে প্রশাসনের এখনই মনোযোগ জরুরি। কেন জলনিষ্কাশনের পরিস্থিতি এতখানি মন্দ হয়ে পড়ছে, নির্ণয় করা ও নিরাময় করা জরুরি। বর্ষাকালে বৃষ্টি হবেই, দু'-তিন ঘণ্টা বৃষ্টিকে খুব বাড়াবাড়িও বলা যাবে না। একটি নিয়মিত ঘটনার ফলে এমন নিয়মিত অব্যবস্থা চলতে পারে না। এবং চাইলেও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার হাল ফেরানো যাচ্ছে না, এমনটা ভাবা কঠিন। অর্থাৎ, অভাবটি সদিচ্ছার। এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার।

পরিকল্পনার অভাবটি সবেচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— খালের পরিস্থিতি দেখলে। বিশেষত দক্ষিণ কলকাতার জল-জমার পিছনে মজে যাওয়া খালের বিষয়টি অতিশয় গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বানতলার দিকে বাসন্তী হাইওয়ের ধারে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন ছোট ছোট খালের মধ্যে দিয়ে সোনারপুর ও রাজপুরের জল ওই এলাকায় ভেড়ি ও চাষের জমিতে পড়ার কথা— কিন্তু তা যে হয় না, এবং কেন যে হয় না, তা খালের দিকে এক বার ফিরে তাকালেই উপলব্ধি হয়। এমন পানায় কানায় কানায় ভর্তি খালের পক্ষে অতিরিক্ত জলধারণ অসম্ভব, এমনকি সাধারণ মাত্রায় জলপ্রবাহণও অসম্ভব। অথচ খুব সহজেই তা করা যেত, প্রশাসনের উদ্যোগ থাকলে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময়ে একাধিক বার শোনা গিয়েছে এমন উদ্যোগের কথা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক স্বর্ণালী জলবাহিত চলাচল পরিকল্পনা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। শেষ পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনাই যে বাস্তবায়িত হয়নি, তার ফল কেবল শহরের সৌন্দর্যায়নের সুযোগ বিনাশ নয়— শহরের বিপুল স্বাস্থ্যহানি। জল নিকাশের পথটি রুদ্ধ করে দিয়ে শহরকেই হাঁসফাঁস পরিস্থিতিতে ক্রমশ নিমজ্জিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যহানি কথাটি নেহাত আলঙ্কারিক নয়— সাধারণ বোধসম্পন্ন নাগরিক মাত্রেই জানেন। ক্রমাগত জল জমার কারণে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জলবাহী দূষণ ও সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ছে। এমনিতেই বর্ষায় এ দিক ও দিক জমা জলের কারণে ডেঙ্গি ঊর্ধ্বমুখী, তার উপর এই নিয়মিত জলমগ্নতা তা অনেকাংশে তীব্রতর করে, ভাইরাল জ্বরও বাড়ে। বর্ষার সমস্যা বর্ষা এলে মেটানো যায় না। সারা বছর তার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় প্রকৃত অসুখটি আসলে বিস্মরণের। বর্ষা চলে গেলেই বর্ষাসঙ্কটও বিস্মৃত হয় এখানকার প্রশাসন। 'আবার পরের বর্ষায় ভাবা যাবে', ভাবটা এই রকম।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সুরক্ষার অধিকার

কলকাতার ধর্মতলা থেকে হাতিবাগান— শহরের ফুটপাতগুলির দিকে তাকালে একটি রূঢ় সত্য বার বার সামনে আসে— ফুটপাত আছে, কিন্তু সেখানে পথচারীদের কোনও অধিকার নেই। হকারদের বেআইনি দখলদারি, যত্রতত্র পার্কিং এবং প্রশাসনের উদাসীনতায় শহরের ফুটপাতগুলি আজ অবরুদ্ধ। ফলে, সাধারণ মানুষকে প্রতি দিন প্রাণ হাতে নিয়ে মূল রাস্তায় নেমে গাড়ির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলতে হচ্ছে, যা যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। এই চরম অব্যবস্থার মধ্যেই ভারতের নগর পরিকল্পনায় এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে কিছু দিন আগে তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর করেছে 'পথচারী নিরাপত্তা ও সর্বজনীন সুগম্যতা নীতি ২০২৬'। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত ঐতিহাসিক নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে তৈরি এই নীতিটি পথচারীদের 'হাঁটার অধিকার'-কে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কলকাতার চিরস্থায়ী ফুটপাত সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে অন্ধ্রপ্রদেশের এই আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার যেমন পথপ্রদর্শক, তেমনই গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

অন্ধ্রপ্রদেশের এই নতুন নীতির মূল দর্শন হল নগর পরিকল্পনাকে 'যানবাহন কেন্দ্রিক' থেকে 'মানুষ কেন্দ্রিক' মডেলে রূপান্তরিত করা। যেমন, ফুটপাতে অন্তত ২ মিটার চওড়া হাঁটার জায়গা-সহ প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য ট্যাকটাইল ইন্ডিকেটর, হুইলচেয়ার র‍্যাম্প, ব্রেল ও শ্রবণযোগ্য সঙ্কেত রাখা বাধ্যতামূলক। অন্য দিকে, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি মোটর যান আইনের ১৯৮এ ধারা প্রয়োগ করে, ত্রুটিপূর্ণ নকশা বা ফুটপাত নির্মাণে গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে দায়ী ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার ও আধিকারিকদের এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ছাড়াও, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এবং সর্বক্ষণের নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন এবং জিআইএস ম্যাপিংয়ের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। বস্তুত, এই নীতি কলকাতার জন্য একটি বড় ধাক্কা এবং শিক্ষণীয় অধ্যায়। শহরে মাঝেমধ্যেই বিচ্ছিন্ন ভাবে 'ফুটপাত দখলমুক্ত' করার প্রশাসনিক বা আইনি তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু কয়েক দিন পরেই পরিস্থিতি আবার আগের রূপ নেয়। এর প্রধান কারণ, এ রাজ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট এবং আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক পথচারী নীতির অভাব। তবে, অন্ধ্রপ্রদেশের এই নীতিটি কাগজে-কলমে যুগান্তকারী হলেও, এর সাফল্য নির্ভর করছে মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়নের উপর। উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের অর্থ, খেটে খাওয়া মানুষের জীবিকায় আঘাত হানা ও তীব্র সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি।

তৎসত্ত্বেও অন্ধ্রপ্রদেশ বলে দেয়, রাস্তা কেবল গাড়ির নয়, শহরের প্রথম অধিকার পথচারীদের। কলকাতা প্রশাসন যদি অন্ধ্রের এই নীতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আধিকারিকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে এবং হকারদের পুনর্বাসনের মানবিক সমাধান খোঁজে, তবেই রাস্তা আবার নিরাপদ হয়ে উঠবে। হকারদের জীবিকা এবং পথচারীদের জীবনের সুরক্ষা— এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করাই হোক আধুনিক নগর পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। প্রশাসন আর মৃত্যুর অপেক্ষা না করে অন্ধ্রের মতো সাহসিকতা দেখিয়ে পথচারীদের 'রাইট টু ওয়াক' নিশ্চিত করুক।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন মৃত্যুফাঁদ

বর্ষাকালে কলকাতায় জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়া এবং তাতে প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতের খবর একটি বহুল পরিচিত ঘটনা। অতএব, জোড়াবাগানের ব্রজদুলাল স্ট্রিটে বাড়ির একাংশ ভেঙে ৫৫ বছরের ঊর্মিলা সাউয়ের মৃত্যু, আরও ১৮ জনের আটকে থাকা এবং পোস্তায় একই সময়ে অনুরূপ ঘটনায় আরও সাত জনের উদ্ধারের খবর অতি দুর্ভাগ্যজনক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। দু'ক্ষেত্রেই বাড়িগুলিকে আগেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমন বাড়ির ক্ষেত্রে ভারী ও লাগাতার বৃষ্টির ফলে ছাদের জমা জল অতিরিক্ত ভার তৈরি করে, ফাটল দিয়ে জল দেওয়াল ও ভিতের গভীরে ঢুকলে কাঠামো ভেঙে ধস নামে। তাই বাড়িগুলিকে বোর্ড ঝুলিয়ে বিপজ্জনক বলে শনাক্ত করলেই প্রশাসনের দায় শেষ নয়, সময় থাকতে এই সমস্যার সমাধানও করতে হবে।

এ কথা ঠিক যে, বহু ক্ষেত্রে এই বাড়িগুলির সঙ্গে মালিকানা, ভাড়াটে বা দখল নিয়ে দীর্ঘ আইনি জটিলতা থাকে। জোড়াবাগানের ঘটনাতেও অনুরূপ সমস্যা সামনে এসেছে। এক পক্ষের দাবি, বাসিন্দারা জবরদখল করে রয়েছেন; অন্য পক্ষের বক্তব্য, তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বাড়ির সংস্কার হয়নি। এই ধরনের মামলা-মকদ্দমা আইনের সময় ও পথ মেনে এগোক, কিন্তু এর কোনওটিকেই মানুষকে অরক্ষিত রাখার কারণ হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না। অতএব, প্রতিটি বিপজ্জনক বাড়ির ক্ষেত্রে লিখিত সমীক্ষা প্রয়োজন। কোন অংশ অবিলম্বে খালি করতে হবে, মেরামত বা সংস্কারের সুযোগ কতটা, কোন অবস্থায় ভাঙাই সমাধান— তা স্পষ্ট ভাবে স্থির করতে হবে, এবং জানাতে হবে। বাসস্থান ব্যবহারের উপযুক্ত না থাকলে আইনানুগ নোটিস দিয়ে তা খালি করানো এবং প্রয়োজনে ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার আইনে বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙা ও পুনর্নির্মাণের পথ রাখা আছে, নতুন আইনের অপেক্ষায় না থেকে বিদ্যমান বিধির বাস্তব প্রয়োগেই বরং সদিচ্ছা ও সমন্বয় বেশি জরুরি। এই সুযোগে সরকার বাড়ি অধিগ্রহণ করছে— নাগরিকের মনে এমন শঙ্কা দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তাকেই প্রকট করে তোলে। তবে, বাড়ি খালি করার অর্থ যেন নির্বিচারে উচ্ছেদ না হয়। কারণ, বহু ক্ষেত্রেই বাসিন্দাদের বাড়ি খালি করায় অনাগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে উপযুক্ত পুনর্বাসনের অনিশ্চয়তা।

এ ক্ষেত্রে আইন ও মানবিকতার মধ্যে কী ভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, আদালতের বিভিন্ন রায়েই তার দিকনির্দেশ মিলেছে। আইনি কাঠামো অনুযায়ী পুনর্বাসনের প্রধান দায় বাড়ির মালিকের। তবে, পুরসভাকেও এ নিয়ে একটি স্পষ্ট নগর-নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তার মধ্যেই থাকবে ঝুঁকি নির্ণয়, সময়সীমা মেনে সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের পদ্ধতি, বিকল্প আবাসনের দায়িত্ব নির্ধারণ। অস্থায়ী আবাসনের খরচ কে, কী ভাবে বহন করবে এবং পুনর্নির্মাণের পরে বাসিন্দাদের কী ভাবে ফিরিয়ে আনা হবে, মালিক বেপাত্তা হলে প্রশাসন কোন দায়িত্ব পালন করবে— সেই রূপরেখাও 'অ্যাকশন প্ল্যান'টির অংশ হওয়া দরকার। আইন পরিবর্তনের প্রতীক্ষা দীর্ঘমেয়াদি, এখন জরুরি ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাটি নিয়েই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ পুরসভার হিসাবেই শহরে বিপজ্জনক বাড়ি প্রায় ৩,৭০০। তার পরও সেগুলির সংস্কার বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা আপৎকালীন নয় কেন, সেটাই প্রশ্ন।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন হিমালয়সমান

এই মুহূর্তে হিমালয় পর্বতমালার দিকে তাকালে বোঝা যায়, 'হিমালয়সমান' সমস্যা বা সঙ্কট কোন মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতের সামনে, ভারতের রাজনীতির সামনে— এখন সবচেয়ে জরুরি কাজগুলির মধ্যে অন্যতম, হিমালয় নিয়ে ভাবা। এ বার নেপালে যা ঘটল, তার জন্য নেপালের যতটা না দায়, প্রকৃত দায় নেপালের উত্তরে ও দক্ষিণে থাকা দুই বৃহৎ, আত্মগর্বী, আত্মবিমোহিত প্রতিবেশী দেশের— চিন এবং ভারত। পাহাড় কেটে একের পর এক হাইওয়ে তৈরি করার ধুম, বাঁধ তৈরিতে সিমেন্ট-কংক্রিটের ব্যাপক দাপট, জঙ্গল কেটে বসতি বানানোর হিড়িক, এবং বৃহত্তর অর্থে পরিবেশ দূষণের লাগামছাড়া অন্যায়ের ফলেই আজ নেপালের এত বিপুল পরিমাণ মানুষ জীবনহারা হলেন। আইপিসিসি রিপোর্ট থেকে শুরু করে বহু গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে, হিমবাহের পশ্চাদপসরণ কিংবা সোজা কথায়, হিমবাহ ভেঙে যাওয়া এখন হিমালয়কে কতখানি গরম করে দিয়েছে। ঠিক দুই বছর আগে নেপালে একটি বিরাট হিমবাহ-হ্রদ প্রবল ভাবে ভেঙে গিয়ে বরফ ও পাথরের বিশালাকার ধস নেমেছিল— যার ক্ষয়ক্ষতি এ বারের মতো না হলেও বিস্মরণযোগ্য নয়। সমগ্র বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বে ভাবা দরকার। ভারত ভাবছে কি?

ভারত ভাবছে কি? কেবল আন্তর্জাতিক গুরুত্বই তো নয়। এমনকি, প্রশ্ন কেবল সঙ্কটাপন্ন প্রতিবেশীর সঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত বাণিজ্য নিয়েও নয়। প্রশ্নটি আসলে এত বড় ভারতের এক বিরাট অংশের জনসমাজ যে হিমালয়ের উপর নির্ভরশীল— কেবল পাহাড়ি প্রদেশগুলি নয়, অসংখ্য বহতা নদীর উৎসসূত্রে সমগ্র উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ভারত যে অর্থে 'হিমালয়ের দান', আজ সেই অর্থেই সমগ্র দেশ 'হিমালয়পরিমাণ' সঙ্কটাপন্ন। সাম্প্রতিক ভয়াল হড়পা বানের কথা ছেড়ে দিলেও গত কয়েক বছরে বর্ষা ও তৎসন্নিহিত সময়ে হিমালয়ে যে পরিমাণ ধস নেমে জনজীবন রুদ্ধ করে দিয়েছে, তাতে কি শোনা যাচ্ছে না বিপদদিনের প্রবল পদধ্বনি? কোশী নদী দিয়ে যে ভাবে জলধারা নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে উত্তর বিহারকে, কিংবা হিমাচল প্রদেশকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে রাখছে পার্বত্য ধসের পুনরাবৃত্তিতে, কিংবা সিকিমে দক্ষিণ লোনাক লেক-এর ভঙ্গুরতার দিকে যে ভাবে গবেষকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন— এ সব কি যথেষ্ট নাড়া দিতে পারছে দেশের শাসকদের? বোঝা যাচ্ছে কি যে আর এতটুকু বিলম্ব করলে বিপদ হাতের বাইরে চলে যাবে? না কি বিপদ ঘটলে তার পর নড়ে বসা যাবে, এটাই বিবেচনা?

সমস্যা আসলে দায়বদ্ধতাতেই। যারা বিপদ ঘটাচ্ছে, তারা বিপন্ন হচ্ছে না। যারা এই বিপদে নিজেদের সব হারিয়ে অবরুদ্ধ, তাদের করার কিছুই নেই। ইতিমধ্যে হিন্দুত্ব রাজনীতির আবহে সমাজমাধ্যম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষী অসহায়তার ধর্মীয় ব্যাখ্যা। মানুষের অপরাধে যখন প্রকৃতি, সমাজ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী সব বিপন্নতার চূড়ায়, তখন সেই অপরাধ থেকে দৃষ্টি সরানোর প্রয়াস নতুন না হলেও তা অবধারিত ও আপত্তিকর। আপত্তি— কেননা মানুষের পক্ষেই এই বিপদ আটকানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। হিমবাহর প্রাত্যহিক সংবাদ রাখা, রাজনৈতিক বাধায় বা রাষ্ট্রনৈতিক সীমান্তের কারণে যাতে নদীখাত গভীর করতে বাধা না পড়ে তা দেখা, নির্মাণকার্যের আতিশয্য বন্ধ করা— এ সব 'ব্যবস্থা' কি হচ্ছে? না কি যাতে সেগুলি করতে না-হয়, দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখা যায়, সেই কারণেই এ সব ব্যাখ্যা-বক্তব্যের অবতারণা চলছে? আর সব ছেড়ে দ্রুত বিষয়টিকে প্রশাসনিক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসা উচিত: শাসক ও বিরোধী, সব রাজনীতিকের কাছেই সমাজের সনির্বন্ধ অনুরোধ। নেপাল-সহ ভারতও আজ আক্রান্ত। আগে ঠিক যে ভাবে পাহাড় বেয়ে নেমে আসত অশ্বপৃষ্ঠারোহী আক্রমণকারীর দল, আজ তেমন করেই নদীখাত বেয়ে, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে আসছে প্রাকৃতিক রোষের তীব্র প্রবাহ— অবিমৃশ্যকারী মানবসমাজকে প্রলয়ে ডুবিয়ে দিতে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন আধুনিক মানে

ভারতীয় রেল বদলাচ্ছে— নতুন লাইন, দ্রুতিময় নতুন ট্রেন, ঝকঝকে স্টেশন, কনকোর্স লিফ্ট এস্কেলেটর— রেলের আধুনিকীকরণ এখন দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নেরও বড় মুখ। তবে কেন্দ্রের তুলে ধরা উজ্জ্বল ছবিটি ম্লান করে দিল সম্প্রতি সংসদে পেশ হওয়া কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর রিপোর্ট। ভারতীয় রেল কি শুধু নতুন নানান কিছু তৈরি করে চলেছে, না কি তৈরি-থাকা পরিকাঠামোও প্রকৃত অর্থেই সচল ও যাত্রী-বান্ধবও রাখতে পারছে— সামনে এসেছে সেই প্রশ্নও। নন-সাবার্বান ৫১২টি রেল স্টেশনে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ৪৫৮টিতেই মূলগত যাত্রী-পরিষেবায় রয়েছে কোনও না কোনও ঘাটতি, সেগুলিও এমন যে শুনলে প্রশ্ন জাগবে, ২০২৬-এ দাঁড়িয়ে এও কি 'আধুনিকীকরণ'-এর বিষয়? শৌচাগার নেই বা ঠিকমতো কাজ করে না, পানীয় জলের ঘাটতি, বসার জায়গার অভাব, যাতায়াতের সুবিধা ভাল নয়— এই সবই ভারতীয় রেলযাত্রীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। পানীয় জলের ক্ষেত্রে যে তথ্য সামনে এসেছে তা অতি উদ্বেগের, আটটি স্টেশনের কুলারের জল-নমুনায় পাওয়া গেছে ই-কোলাই, জলে মলজাত দূষণের আশঙ্কাও গুরুতর।

রেলের তরফে জলের কুলার, ট্যাঙ্ক, ফিল্টার পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার অভিযান হয়েছে, কোন স্টেশনে কী সমস্যা তা নথিবদ্ধ করে তার সমাধান হয়েছে কি না নজরে রাখার কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু আসল প্রশ্নটি তাতে স্পষ্টতর হয়: যাত্রী-পরিষেবা ও রেলের পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ কি আদৌ ঠিক করে হচ্ছে? জলের কুলার, শৌচাগার, এস্কেলেটর থেকে প্ল্যাটফর্ম, সব কিছু ঠিক রাখা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণও আধুনিকীকরণের অঙ্গাঙ্গি; কত কিমি নতুন লাইন হল, কত স্টেশন নতুন করে সাজানো হল, বুলেট ট্রেন কবে আসছে— স্রেফ এগুলিই নয়। রেলযাত্রী ট্রেনে ওঠার আগে একটু পরিষ্কার জায়গায় বসতে পারবেন কি না, শৌচাগারটি ব্যবহারযোগ্য কি না, স্টেশনের জল নিরাপদ কি না, বৃষ্টির সময় প্ল্যাটফর্মে মাথার উপর ছাউনি আছে কি না— এই অতি সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তরই কি রেলের আধুনিকীকরণের প্রকৃত নির্ধারক নয়?

এ প্রসঙ্গেই আসে অর্থ ব্যয় ও বরাদ্দের প্রশ্নটিও। রেলের আধুনিকীকরণে সরকারি অর্থের বিরাট ভূমিকা, ২০২৬-২৭ সালে ভারতীয় রেলের জন্য প্রস্তাবিত মূলধনি ব্যয় ২.৯৩ লক্ষ কোটি, এর প্রায় ৯৫ শতাংশই আসবে কেন্দ্রের বাজেট-সহায়তা থেকে। অন্য দিকে, এই অর্থবছরে রেলের পরিচালন-অনুপাত (অপারেটিং রেশিয়ো) ধরা হয়েছে ৯৮.৪ শতাংশ। রেল যে টাকা আয় করছে তার প্রায় পুরোটাই চলে যাচ্ছে পরিচালন-ব্যয়ে, হাতে থাকছে খুব সামান্য— তা স্পষ্ট। এই যেখানে বাস্তব, সেখানে এ-প্রশ্ন আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ: ভারতীয় রেল যত নতুন সম্পদ তৈরি করবে, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ও তত বাড়বে। নতুন স্টেশন, নতুন জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নতুন এস্কেলেটর, শৌচাগার, প্ল্যাটফর্ম— এই সব কিছুই দরকার, আরও দরকার এই সব কিছুর নিয়মিত পরিচর্যা। আধুনিকীকরণের আসল অর্থ তা-ই— পুরনো নতুন দু'টি ব্যবস্থাই প্রতিদিন ঠিকঠাক চালিয়ে যাওয়া। নতুনের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুরনোকে রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু সংস্কৃতি না আসে, তা হলে রেলে বিপুল বিনিয়োগের সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন অগ্নিমূল্য

বাজারে চিনির দাম প্রবল গতিতে ঊর্ধ্বমুখী। দু'মাস আগেও খুচরো বাজারে মোটামুটি চল্লিশ টাকা কিলোগ্রাম দরে বিক্রি হত চিনি; বাড়তে বাড়তে তা পঁয়ষট্টি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। তবে সরকার জানিয়েছে যে, বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পরে এক্স মিল বা উৎপাদকদের নেওয়া দাম হ্রাস পেয়েছে ২০ শতাংশ। আশা করা যায়, পাইকারি এবং খুচরো বাজারেও তা প্রতিফলন ঘটবে। চিনির দাম হঠাৎ এমন বাড়ল কেন, তার একাধিক কারণ। প্রথমত, ফসলের রোগ, এবং অসময়ে বৃষ্টি, দুই কারণে স্বাভাবিকের তুলনায় আখের প্রকৃত উৎপাদন দশ শতাংশ কম হয়েছে। কিন্তু, উৎপাদন যে কম হবে, সেটা হাতে যথেষ্ট সময় থাকতেই টের পাওয়া গিয়েছিল। তার পরও কেন্দ্রীয় সরকার চিনি রফতানিতে উৎসাহ দিয়েছিল। কেন, সে উত্তর অস্পষ্ট। তার পর পাইকারি বাজারে চিনির দাম হুহু করে বাড়তে থাকায় রফতানি নিষিদ্ধ হল, এবং আমদানির উপরে শুল্ক মকুব করে দেওয়া হল। একই পণ্যের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে এমন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি নীতি গ্রহণে স্পষ্ট যে, কৃষি-অর্থনীতি কোন পথে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হয় ধারণা নেই, অথবা কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর কোনও গভীরতর স্বার্থের গুরুত্ব ভারতীয় অর্থব্যবস্থার স্বার্থের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন কারণটি কম বিপজ্জনক, বলা মুশকিল।

আখের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ঘাটতি অবশ্য চিনির মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। বৈশ্বিক স্তরে আখের বৃহত্তম উৎপাদক ব্রাজ়িলেও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। ফলে, আন্তর্জাতিক বাজারেও চিনির দাম ঊর্ধ্বগামী। এই পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ ঘাটতি বিশেষ উদ্বেগ তৈরি করেছে। তার ফলে চিনি মজুত করার প্রবণতাও বেড়েছে। নরম পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা বা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা চিনির বড় মাপের ক্রেতা। সাধারণ অবস্থায় যখন যেমন প্রয়োজন হয়, এই ব্যবসায়ীরা তখন তেমন ভাবে চিনি কিনতে থাকেন। কিন্তু, বাজারে জোগানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় সংস্থাগুলি বেশ কয়েক মাসের চিনি একলপ্তে কিনতে আগ্রহী হয়েছে। ফলে, বাজারের মূল্যস্তরে তারও প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম বেঁধে দিয়েছে যে, এই পাইকারি ক্রেতারা এক সঙ্গে ১৫ দিনের চেয়ে বেশি চিনি কিনতে পারবেন না। তাতে চাহিদায় খানিক হলেও রাশ টানা যাবে। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বছরের সবচেয়ে বেশি চাহিদার মরসুম আসছে— পূজা-দীপাবলি থেকে বড়দিন অবধি। ফলে, চিনির জোগান এবং সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাদের উদ্বেগও স্বাভাবিক। ৩১ অক্টোবর অবধি বিনা শুল্কে মোট দশ লক্ষ টন চিনি আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার— গত এক দশকে এই প্রথম এত বড় মাপে চিনি আমদানি করছে ভারত।

কেন্দ্রীয় সরকার অতি দ্রুত জানিয়েছে, চিনির বাজারে জোগানের পিছনে ইথানল উৎপাদনের দায় নেই। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি সত্য। ২০২২-২৩'এ দেশের মোট আখ উৎপাদনের ১২ শতাংশ যেত ইথানল উৎপাদনে; এখন এই অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে ন'শতাংশে। বর্তমানে ইথানল উৎপাদনের প্রধান উপাদান খাদ্যশস্য, মূলত ভুট্টা। সমস্যা হল, বাজার কেবলমাত্র বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতেই চলে না— তা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতির হিসাবও কষে। কেউ বলতেই পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে ভঙ্গিতে ইথানলের উপরে জোর দিচ্ছে, তাতে বাজারে অনুমানের যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভবিষ্যতে ইথানলের উৎপাদন আরও বাড়বে। সেই বর্ধিত উৎপাদনকে সামাল দেওয়ার মতো ভুট্টা ভারতে উৎপন্ন হয় না। তার উৎপাদনশীলতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ফলে, ইথানল উৎপাদনে জোর বাড়লে সে ক্ষেত্রে আরও বেশি আখ চলে যাবে, অতএব চিনি উৎপাদনের জন্য আখের জোগানে ঘাটতি দেখা দেবে, বাজারে এমন আশঙ্কা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই, শুধু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাই নয়, বাজারের সংশয় দূর করতেও সরকারের উদ্যোগ প্রয়োজন।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

লঙ্ঘন

গণতন্ত্রে সরকারের, বা শাসক দলের সমালোচনা নাগরিকের স্পর্ধা নয়, সাংবিধানিক অধিকার— এ-কথা আজকের ভারতে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে ক্রমাগত। তার একটি সাম্প্রতিক এই তথ্যের সূত্রে: এ বছর মার্চ থেকে জুলাই পাঁচ মাসে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও ইউটিউবকে প্রায় ১.৯৫ লক্ষ 'অনলাইন কনটেন্ট' সরানোর বা ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। সময়ের হিসাব করলে, এমন নির্দেশ গিয়েছে গড়ে দিনে প্রায় ১,২৭৫টি, অথবা প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে একটি করে! সরকারের তথ্যেই পাওয়া যাচ্ছে আরও বড় এক সংখ্যা, প্রায় ২.৯৮ লক্ষ ইউআরএল সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ। কেন্দ্রের বক্তব্য, এর প্রায় ৮২ শতাংশ এসেছে রাজ্য সরকারগুলি থেকে। সংখ্যার হিসাব, কেন্দ্র-রাজ্য নির্দেশের গোনাগুনতি সরিয়ে রাখলেও, ডিজিটাল পরিসরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যে বাড়ছে, তা কি অস্বীকার করা চলে?

ডিজিটাল পরিসর, বিশেষত সমাজমাধ্যম এ যুগে সাধারণ নাগরিকের মতপ্রকাশের দ্রুততম ও সবচেয়ে সুবিধাজনক ক্ষেত্র, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে সময়কালের কথা বলা হচ্ছে, তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ওই সময়েই নিট-এর প্রশ্ন ফাঁস ও পরীক্ষা বাতিলের জেরে বিরাট ছাত্র-আন্দোলন হয়েছে, নাগরিক ও সুশীল সমাজ মুখর হয়েছে তাদের সমর্থনে, রাজপথের পাশাপাশি ডিজিটাল পরিসরেও বিরুদ্ধস্বর ঘনিয়েছে। ডিজিটাল পরিসরে নাগরিকের যে মত সরকার বা শাসকের পক্ষে অপ্রিয় ও অস্বস্তিকর, তা বন্ধ করতেই এই কনটেন্ট অপসারণ বা রোধের নির্দেশ— এমন ভাবা খুব অসঙ্গত কি? অবশ্যই সব অনলাইন কনটেন্ট মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষার আওতায় পড়ে না; ডিজিটাল ক্ষেত্রে আর্থিক বা অন্য প্রতারণা, নারী ও শিশু-নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিষয়, হিংসায় উস্কানি বা ক্ষতিকর ডিপফেক-এর বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। প্রশ্ন তা নিয়ে নয়। প্রশ্ন হল, সাইবার-অপরাধের 'কনটেন্ট' এবং নাগরিকের মতপ্রকাশ তথা বিরুদ্ধমত প্রকাশকারী 'কনটেন্ট'— উভয়ের ক্ষেত্রে কি প্ল্যাটফর্মগুলিকে একই রকম পদক্ষেপ করতে বাধ্য করা চলে? কোন মাপকাঠিতে, কোন আইনি প্রক্রিয়ায়, কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে ডিজিটাল কনটেন্টের 'বৈধতা' যাচাই করা হবে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার, নাগরিকের সামনে তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা দরকার। উপরন্তু, 'বেআইনি' কনটেন্ট সরানোর সময়সীমা সম্প্রতি তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এত অল্প সময়ে প্রতিটি নির্দেশের বৈধতা, এমনকি সব কনটেন্ট যাচাই করাও কি সম্ভব? ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ পথ তাই কোনও প্রশ্ন না করে স্রেফ কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে তা-ই ঘটছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল ভারত নিয়ে অনেক ইতিবাচক কথা বলে থাকে। প্রশ্ন জাগে, ডিজিটাল ভারত মানে কি শুধু দ্রুততর ইন্টারনেট? ডিজিটাল পরিসরেও নাগরিক যেন স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করতে, প্রশ্ন করতে, প্রয়োজনে সরকারের সমালোচনাও করতে পারেন, সেই নিরাপদ পরিসর তৈরি করা কি ডিজিটাল ভারতের অংশ নয়? বেআইনি বা ক্ষতিকর কনটেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার ছলে যদি নাগরিকের ডিজিটাল মন্তব্য, সমালোচনা, এমনকি কৌতুকের পরিসরও খর্ব করা হয়, তা অতি দুর্ভাগ্যের। উদ্বেগেরও— কারণ তা শেষ পর্যন্ত নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন, গণতন্ত্রেও হস্তক্ষেপ।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

প্রলয়ঙ্কর

হড়পা বান, ভূমিকম্প এবং তুষারধস— পাহাড়ি অঞ্চলের দুঃস্বপ্ন। নেপালের অতীব দুর্ভাগ্য, তাকে একত্রে এই তিন ধরনের বিপর্যয়ের সম্মিলিত পরিণতিটি প্রত্যক্ষ করতেহল। এবং বিপদ এখনও কাটেনি। বরং, তিব্বতের দিকে তুষারধসে সৃষ্ট হ্রদ উপচে জল নামতে শুরু করায় আর এক দফা প্লাবনের প্রহর গুনছে নেপাল। সতর্ক করেছে চিনও। ইতিমধ্যেই হাজারের অধিক মানুষ নিখোঁজ। রয়েছেন অনেক ভারতীয়ও, যাঁদের অধিকাংশই কৈলাস-মান সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে নেপাল-চিন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জড়ো হয়েছিলেন। বিভিন্ন ভিডিয়োতে বিপর্যয়ের যে চিত্র ধরা পড়েছে, তা সহসা দেখে 'বাস্তব' বলে মনে হয় না। বিশাল উচ্চতার কাদাজলের ঢেউ উন্মত্ত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অভিবাসন কেন্দ্রের আশপাশের অঞ্চলে, মুহূর্ত-মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছিল উঁচু বাড়ি, রাস্তা, দাঁড়িয়ে থাকা বাস-গাড়ি— সব কিছু। সে দৃশ্য দেখে মনে হয় প্রযুক্তির কারসাজি, চলচ্চিত্রের পর্দায় হামেশাই যেমনটি দেখা যায়। মর্মান্তিক সত্য এটাই যে, এর মধ্যে তিলমাত্র কল্পনা মিশে নেই, সবটাই চরম বাস্তব। হিমালয়ের কোলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অঞ্চল বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে এখন এমনই এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-ফাঁদে পরিণত হয়েছে, যেখানে যে কোনও মুহূর্তে, রোদ ঝকঝকে আপাত-শান্ত দিনেও প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধরে নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সমস্ত কিছু।

কেন এমন ভয়াবহ বিপর্যয়— তার নানা ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটলে অনুমান পর্ব পেরিয়ে নিশ্চিত কারণের দিকে হয়তো আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু একটি বিষয়কে এখনই স্বীকার করে নেওয়া ভাল— বিশেষজ্ঞরা বহু আগে থেকে বহু বার যে সতর্কবার্তা দিয়ে এসেছিলেন নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা হিমালয় সম্পর্কে, বিগত কয়েক বছরে তা বর্ণে বর্ণে সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। উষ্ণায়নের কারণে অপ্রত্যাশিত মাত্রায় হিমবাহের গলন এই পর্বতমালার অন্দরে-কন্দরে এমন সব মারণাস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, যার এক-এক বারের প্রয়োগে বিস্তীর্ণ এলাকা স্রেফ 'নেই' হয়ে যেতে পারে, নেপাল, সিকিম, উত্তরাখণ্ডের মতো। এবং সেই মহা বিপদ থেকে পরিত্রাণের আর কোনও পথই সম্ভবত খোলা নেই। তাই বারে বারেই অসহায় ভাবে দেখতে হবে কী ভাবে পাহাড়ি নদী হঠাৎ ভয়াল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সাজানো-গোছানো জনবসতির উপর। প্রযুক্তিতে ধরা পড়বে প্রাণভয়ে কী ভাবে মানুষ ছুটে বাঁচতে চাইছে সেই সাক্ষাৎ-মৃত্যুর হাত থেকে কিন্তু পারছে না, কিছু পরেই সব ধুয়ে মুছে কাদামাখা বিবর্ণ বিধ্বস্ত চিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে এক আস্ত লোকালয়। তেরো বছর আগে কেদারনাথ দিয়ে যার শুরু, সেই 'হিমালয়ের সুনামি' কিন্তু নেপালেই শেষ হবে না। দুঃসহ স্মৃতি কাটিয়ে না উঠতেই ফের হয়তো আরও এক বিপর্যয় সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নেবে। আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, মৃত-আহতের সংখ্যা গোনা এবং ক্ষতিপূরণের অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে সংশ্লিষ্ট দেশ-রাজ্য-জেলার প্রশাসন। কারণ, সেই বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আর তাদের হাতে নেই।

এই মাপের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রোখার ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকে না ঠিকই, বিশেষত অনেক বিশেষজ্ঞই যেখানে এই ক্ষেত্রে উপত্যকার উপর হিমবাহের এক বিশাল অংশ ধসে পড়ার কারণটিতে জোর দিচ্ছেন। কিন্তু যেটুকু আটকানোর ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল, সেই কাজও কি করা হয়েছিল? পাহাড়ি নদীর দু'পাশে, প্রায় নদীর ঘাড়ের উপর বহুতল, রাস্তা নির্মাণ, যেখানে-সেখানে বাঁধ নির্মাণ করে পাহাড়ি নদীর গতি নিয়ন্ত্রণের অক্ষম চেষ্টা, জঙ্গল উড়িয়ে 'উন্নয়ন'-এর গান গাওয়া— এর প্রত্যেকটি হিমালয়ের ভূপ্রকৃতিকে তিলে তিলে শেষ করেছে। শুধু নেপাল নয়, সিকিম, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল— সর্বত্র প্রতি বছর বিপর্যয় যে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে, তার পিছনে এই নির্বুদ্ধিতা অনেকাংশে দায়ী। শয়ে শয়ে প্রাণ প্রতি বছর সেই নির্বুদ্ধিতারই খেসারত দিয়ে চলেছে, আগামী দিনেও চলবে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

অন্যায়

মেঘালয়ে পাঁচটি বড় সিমেন্ট সংস্থা ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ সময়কালে প্রায় ১.৮৫ কোটি মেট্রিক টন চুনাপাথর উত্তোলন করেছে, যার মধ্যে প্রায় ১.৪৪ কোটি মেট্রিক টনের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যাখ্যা বা প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নেই— জানা গেল কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে। এহ বাহ্য, খননকার্যের কারণে পরিবেশ ও জনজীবনের যে ক্ষতি হয় তা পূরণে, খনি এলাকার মানুষের শিক্ষা জনস্বাস্থ্য পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন (ডিএমএফ)-এ মাইনিং সংস্থাগুলির যে টাকা দেওয়ার কথা, রাজ্য সরকারের তরফে তা-ও আদায় হয়নি; তথ্যমতে তা প্রায় ৪৩.৯৫ কোটি টাকা! রাজ্যের সাফাই, ওই খননকাজ হয় নির্ধারিত লিজ় এলাকার বাইরে, তাই সংস্থাগুলির থেকে ডিএমএফ-এর অর্থ আদায় হয়নি।

এখানেই খনিজ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গোড়ার প্রশ্নগুলি জেগে ওঠে। আইনের ফাঁক গলে যদি কোনও সংস্থা বিপুল পরিমাণ খনিজ উত্তোলন করে, অথচ রাজ্যের কোষাগারে পয়সা না দেয়, সেই সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতাও অগ্রাহ্য করে, তবে তা যেমন আইনের অপব্যবহার, তেমনই নীতি ও নৈতিকতারও লঙ্ঘন। ২০২৬-এর খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইনে খনিজ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত রাজস্বের সিংহভাগ যাতে রাজ্যগুলির কাছেই যায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে— খনিজ উত্তোলনের রয়্যালটি, নিলাম প্রিমিয়াম, ডিএমএফ, জিএসটি— এই সবই রাজ্যের প্রাপ্য। উপরন্তু বলা হয়েছে খনন-প্রভাবিত অঞ্চলে রাস্তা, হাসপাতাল, স্কুল ও পানীয় জলের পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও— ডিএমএফ-এ আসা অর্থ সেই কাজে লাগানোর কথা। বলার অপেক্ষা রাখে না— রাজ্য সরকারের প্রাপ্য খনিজ রাজস্ব যথাযথ পথে আদায় হচ্ছে কি না, আদায় হওয়া অর্থে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কি না, তার নজরদারির দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। আইনের ফাঁক, অস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা প্রশাসনিক নজরদারির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাইনিং সংস্থাগুলি যদি সেই অর্থ না দেয়, তা শুধু সংস্থাগুলিরই অপরাধ নয়, প্রশাসনেরও ব্যর্থতা। কোন সংস্থা কত খনিজ তুলছে, নির্ধারিত 'লিজ়-এরিয়া' ও বাইরের খননের মধ্যে তফাত কী, পরিকল্পিত খনন ও অনির্ধারিত খননের ক্ষেত্রে ডিএমএফ-এর অর্থ আদায়ের ব্যবস্থাই বা কী, রাজ্য সরকার তার কতটা আদায় করল, সেই অর্থ কোন প্রকল্পে ব্যয় হল— এই সব কিছুর স্পষ্ট মানদণ্ড, তথ্য এবং ব্যাখ্যা জরুরি।

মেঘালয়ের ঘটনায় সিএজি রিপোর্টে এই তথ্যও সামনে এসেছে, যে সংস্থাগুলি সরকারের নিয়ম মেনে বৈধ লিজের অধীনে খনিজ উত্তোলন করেছে, তাদের তুলনায় 'অভিযুক্ত' পাঁচটি সংস্থার বার্ষিক গড় খনিজ উত্তোলনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। অর্থাৎ যারা নিয়ম মেনে, নির্ধারিত পারমিট বা লিজ়-এর অধীনে খনিজ তুলছে, ডিএমএফ-এ অর্থও দিচ্ছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং অন্যায় সুবিধা তুলছে নিয়ম-ভাঙা সংস্থাগুলি। এই বৈষম্য প্রশাসন ও শিল্প সংস্থার অশুভ আঁতাঁতেরও ইঙ্গিত দেয় না কি? সরকারের ভিতরেও সব কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলছে কি না, সেটাও প্রশ্ন। একটি রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সরকার, শিল্প, রাজস্ব ও জনস্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা কত জরুরি।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন মুঠোফোনের ফাঁদ

কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নার্সারি শ্রেণির ভর্তি-প্রক্রিয়ায় শিক্ষকেরা নজর করছেন শিশুরা কতটা মোবাইল বা টিভিতে আগ্রহী। অভিভাবকেরা সাজানো-গোছানো উত্তর দেন, তাই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সত্যটি জানার চেষ্টা চলছে। যুক্তিটি অমূলক নয়। শৈশবে দীর্ঘ সময়ের স্ক্রিন-আসক্তির সঙ্গে ভাষাগত বিকাশের প্রতিবন্ধকতার যোগাযোগ প্রমাণিত। কারণ, বাল্যের প্রথমে মস্তিষ্ক, ভাষা, মনোযোগ, সামাজিক যোগাযোগের দ্রুত বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি সরাসরি মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময়। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা এই সামাজিক অভিজ্ঞতার পথ রোধ করে। ফলে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, এমনকি মস্তিষ্কের অসুখের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। অতএব, শিশুকে স্ক্রিন থেকে দূর রাখতে অভিভাবককে দায়িত্ব যে নিতেই হবে, এ নিয়ে দ্বিমত নেই।

তবে, ভর্তি-প্রক্রিয়ায় স্ক্রিন-ব্যবহার নিয়ে এমনধারা জেরা বা প্রায় গোয়েন্দার ঢঙে অনুসন্ধান কি পরিবারটিকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলে না? বর্তমানে মা-বাবা দু'জনেই চাকরি করেন, এমন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। সবার কাছে যৌথ পরিবারের বা শিশুকে সামলানোর মানুষের সুবিধাও নেই, সীমিত সময়ের মধ্যে অনেক দায়িত্ব সামলাতে হয়। তার জন্য ফোনের ফাঁদে পড়ার সুযোগ বাড়তে পারে, যা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু মা-বাবাকে 'অবহেলা করেন' বলে দাগিয়ে দিলে ভর্তির সুযোগ হারানোর ভয়ে বাস্তব পরিস্থিতি লুকোনোর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। যে পরিবারে বই, খেলনা, খোলা জায়গা, সহায়তাকারী, অবসর সবই সহজলভ্য সেখানে শিশুর পর্দা-নির্ভরতার সুযোগও কম। কিন্তু এই পার্থক্যকে শিশুর যোগ্যতা বা অভিভাবক হিসাবে দক্ষতার মাপকাঠি নির্ণয় করলে ভর্তির প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্য দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ ও বিকাশের সমান সুযোগ দেওয়ার শিক্ষার অধিকার আইনটিও তখন লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা। তা ছাড়া, আজকের আড়াই-তিন বছরের শিশুরা মূলত জেনারেশন আলফা ও জেনারেশন বিটার সন্ধিক্ষণের। তাদের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরাও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাননি। এরা এমন পৃথিবীর অংশ যেখানে প্রযুক্তিও ঘরের সদস্য। অতএব, এ ক্ষেত্রে স্ক্রিনকে পুরোপুরি এড়ানোর শর্ত দেওয়া কার্যত অবাস্তব। স্ক্রিন-এর সঙ্গে পরিচিত মানেই শিশুটি মেধাগত ভাবে পিছিয়ে, তা মনে করলে আলফা প্রজন্মের লালনপালনকে আগের প্রজন্মের নিক্তিতে বিচার করা বড় ভুল হবে। সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্কুল ও অভিভাবক একযোগে সমাধানের পথ খোঁজাই জরুরি। অভিভাবক যদি পর্দা-নির্ভরতা কমাতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন ও নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানাতে দ্বিধা না করেন, স্কুল যদি খোলামেলা কথোপকথনের পরিবেশ দেয়, বিকল্প কার্যকলাপের সুযোগ বাড়ায়, কর্মরত অভিভাবকদের বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেয়— তবে সুরাহা হতে পারে। কারণ, সবচেয়ে জরুরি কথা, এই বয়সে অভ্যাস বদলানো, নতুন আচরণ শেখানো সহজ। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর মস্তিষ্কের অনেকখানি গঠিত হয়। তাই, গুরুত্বপূর্ণ এই সময়কে ফলপ্রসূ করে তোলার সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া উচিত। সেই রাস্তা কঠিন করলে, সর্বাধিক ক্ষতি হবে শিশুটির— যে জানে না সে আলফা না বিটা এবং তার শৈশবের পরীক্ষা কেন চলছে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সলিলসমাধি

রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলার পথ’ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট নিয়ে এখন কিঞ্চিৎ শোরগোল পড়েছে, তা কি নেহাতই অপ্রত্যাশিত ছিল? বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রক্রিয়াটি যত অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলবে, তত সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে তীরবর্তী অঞ্চলগুলি বিপন্ন হয়ে পড়বে, এ কথা আগেও আন্তর্জাতিক নানা রিপোর্টে উঠে এসেছে। কলকাতা, মুম্বই উভয় শহরই সমুদ্রোপকূলবর্তী। স্বাভাবিক ভাবেই উষ্ণায়নের গতি স্তিমিত না হলে আগামী দিনে এই শহর দু’টির লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি, জীবন, জীবিকা হারিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়বেন। ঠিক সেই কথাটিই রাষ্ট্রপুঞ্জ তার রিপোর্টে আরও এক বার মনে করিয়ে দিয়েছে। এবং জানিয়েছে, সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি এখন আর কোনও সুদূরের সতর্কবার্তা নয়, এখন সেটাই ঘটে চলেছে এবং আগের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে। এই রিপোর্ট সাম্প্রতিক কালে যে ভাবে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে, তার অন্যতম কারণ— এত কাল মানুষ যাকে অন্য দেশের বিপদ বলে মনে করত, এখন তা তার দোরগোড়ায় উপস্থিত। ঘরের কাছেই, কখনও ঘরের পাশেই একের পর এক বিপর্যয় তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

এত দিনে স্পষ্ট, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে রাখার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলি প্রায় ব্যর্থ। এখনও সম-গুরুত্ব সহকারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা প্রস্তুত করেনি বিশ্বের বহু দেশ এবং দরিদ্র দেশগুলিতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি পরিকাঠামো গড়ে তোলায় উন্নত দেশগুলি যথেষ্ট সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ফলে, বিপদরেখা ছুঁয়ে ফেলা গিয়েছে সহজেই। আগামী দিনে তারই করুণ পরিণতি ভুগতে হবে প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগরের উপকূলের অসংখ্য বাসিন্দাকে। বাদ পড়বে না অতলান্তিক-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অংশও। সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির অর্থ শুধুমাত্র কিছু দ্বীপের তলিয়ে যাওয়াই নয়, বিপদ বহুস্তরীয়। মিঠে জলের উৎসে মিশবে সাগরের নোনা জল, ছড়িয়ে পড়বে চাষজমিতেও, হারিয়ে যাবে প্রবাল প্রাচীর, তীব্রতর হবে বন্যার আঘাত, বাড়বে উপকূলীয় ক্ষয়। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনে তার প্রভাবটি স্পষ্ট। সমুদ্রের গ্রাসে হারিয়েছে ঘোড়ামারা দ্বীপ, জম্বুদ্বীপের বড় অংশ। বিনষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ঢাল ম্যানগ্রোভ। ম্যানগ্রোভের প্রাচীর না থাকলে শক্তিশালী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ভবিষ্যতে সরাসরি আঘাত হানবে কলকাতায়।

আগামী দিনের এই ঘরবাড়ি-জীবিকাহারা বিপুল পরিমাণ মানুষের জন্য এখনও কোনও আইনের উপস্থিতি নেই ভারতে। আবহাওয়াজনিত কারণে যাঁরা ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁদের অভ্যন্তরীণ ভাবে বাস্তুচ্যুত হিসাবে দেখাই দস্তুর। এবং, আগামী দিনে তাঁদের পুনর্বাসন বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও ভাবনা নীতি নির্ধারকদের আলোচনায় নেই। উদ্বেগের বীজটি লুকিয়ে আছে এখানেই। সুন্দরবন জানে, জলের গ্রাসে, ঝড়ের দাপটে তলিয়ে যাওয়া বাস্তুভিটে, চাষের জমির অর্থ কী। জানে, তার ধাক্কায় কী ভাবে রাতারাতি বদলে যেতে পারে একটি গোটা অঞ্চলের জনবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক কাঠামো। বন্ধ হয় শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের স্বপ্ন। বিপন্নতর হয় মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা। ভারতের দুর্ভাগ্য, কলকাতা-সহ তার বিস্তীর্ণ উপকূলভাগের বহু অঞ্চল এখন সেই অনিশ্চয়তারই প্রহর গুনছে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন বিকল্পহীন

ভারতে প্যাকেটজাত খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ‘লেবেল’ বা চিহ্ন চালু করার প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফএসএসএআই)। কোনও খাবারে উচ্চমাত্রায় ফ্যাট, চিনি ও লবণের মধ্যে অন্তত দু’টি থাকলেই প্যাকেটের গায়ে সামনের দিকে লাল ষড়ভুজ চিহ্ন বসানোর কথা হচ্ছে, যা দেখে ক্রেতারা বুঝবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে তা কতটা অনুকূল। এতকাল এমন খাদ্য-পানীয়ের উপাদান ও পুষ্টিগুণের হিসাব লেখা থাকত প্যাকেটের পিছনে, এখনও তা-ই থাকে। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা সেই তথ্য পড়তে ও পড়ে বুঝতে ক্রেতার সময় লাগে, সিদ্ধান্তের কথা তারও পরে— দোকানে-বাজারে জিনিস কেনার সময় সেই অবকাশ কোথায়? অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলছে, চিপস, বিস্কুট, চকলেট, ঠান্ডা-পানীয়’সহ বহু প্যাকেটজাত খাদ্যে-পানীয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট, লবণ, চিনি থাকে, এবং তা ক্ষতিকর। এই তথ্য ক্রেতার জানা দরকার, এবং তাঁরা তা তখনই জানতে পারবেন যখন খাদ্য নির্মাণ সংস্থাগুলিও তা প্যাকেট, মোড়ক বা কৌটোর গায়ে স্পষ্ট করে ও বোধগম্য ভাবে লিখে জানাবে। প্যাকেটের সামনের দিকে দৃশ্যমান সতর্কবার্তা সেই ব্যবধান কমাবে, সে কারণেই উল্লিখিত প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ।

আরও গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য যে, এ এখনও প্রস্তাবিত, স্থির সিদ্ধান্ত নয়। আর এটুকুও সম্ভব হয়েছে জনসাধারণের দীর্ঘ অসন্তোষে এবং সর্বোপরি শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে। খাদ্য নির্মাণ সংস্থাগুলির বক্তব্য, এ ধরনের প্রতীক বিভ্রান্তিকর, তা খুব কাজে দেবে না— বরং ক্রেতা তথা উপভোক্তাকে খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য পড়ার বিষয়ে বেশি সচেতন করা দরকার। প্যাকেটের গায়ে চিহ্ন বা ‘লেবেল’ থাকলেই যে ক্রেতা এ ধরনের খাবার খাবেন না বা কিনবেন না তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তা বলে লেবেলের প্রয়োজনীয়তা কমে যায় না। বিদেশে, ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে প্যাকেটজাত খাদ্য-পানীয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কী কিনছেন তার যাবতীয় তথ্য তাঁর চোখের সামনে থাকে; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই খাবার ভারতের নির্মাতা সংস্থারই তৈরি। বিদেশে কড়াকড়ি থেকে মুক্তি নেই বলে এক রকম ব্যবস্থা, আর দেশে অন্য রকম— এতেই কি বেনিয়ম ও বৈষম্যের চেহারাটা স্পষ্ট নয়?

এই সার্বিক চিত্রটিতে যে সরকারের একটা বড় ভূমিকা আছে, নাগরিক তথা ক্রেতার তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বাজারে কোনও পণ্যে চিনি, লবণ, স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা অন্য উপাদানের কোনটা কতটা আছে, সেই তথ্য জানা ক্রেতার অধিকার। উপরন্তু তা সরাসরি জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত— ভারতে দ্রুত বাড়ছে স্থূলতা ও জীবনযাপনজনিত অসুখ; শিশুদের শারীরিক স্থূলতা বা ‘চাইল্ড ওবেসিটি’র হার শঙ্কাজনক— এবং এর পিছনে বহুবিধ কারণের অন্যতম প্যাকেটজাত খাবার, অস্বীকারের উপায় নেই। খাদ্য নির্মাতা সংস্থা জানে তার পণ্যে কত চিনি, লবণ বা ফ্যাট, ক্রেতা জানেন না। এই পরিস্থিতিতে খাদ্য নির্মাতা সংস্থা যদি সেই তথ্য জানাতে গড়িমসি করে, সরকার তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সংস্থাগুলিকে তা স্পষ্ট ভাবে জানাতে বাধ্য করা, অন্যথায় কড়া পদক্ষেপ করা। খাবারের উপাদান নিয়ে কঠোর মানদণ্ডের বিকল্প নেই। নীতিনির্ধারণের টেবিলে খাদ্য সংস্থার বক্তব্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হওয়া উচিত জনস্বাস্থ্য।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন আশ্রয়ের নীতি

দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে জল-সংযোগ নেই কলকাতার একটি বস্তিতে। এই সিদ্ধান্ত কার? কাশীপুর-বেলগাছিয়ার জ্যোতিনগর কলোনির বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের উচ্ছেদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে সরকার। পুরসভা দায় স্বীকার করেনি। ওই বাসিন্দারা অবৈধ ভাবে সেখানে বসবাস করছেন কি না, সে প্রশ্ন প্রশাসন তুলতেই পারে। কিন্তু জল-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার কি প্রশাসনের রয়েছে? সরকারি জমির পুনরুদ্ধার করতে চাইলেও তা সরকারি বিধি মেনেই করতে হবে। প্রায় পাঁচশোটি পরিবার ২৯ জুলাই থেকে জলসংযোগহীন, কিছু দিন ওই বস্তিতে রাস্তার আলোর বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন ছিল। এ কাজ কেবল বেআইনি নয়, অমানবিক। জ্যোতিনগর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, বাম-প্রভাবিত এলাকা বলে তার প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয়েছে, এই অভিযোগও উদ্বেগজনক। বিজেপি সরকার রাজ্যে আসার পর পুরসভা, রেল বা বন্দরের এলাকা থেকে বস্তি উচ্ছেদের যে চেষ্টাগুলি হয়েছে, তার অধিকাংশই কলকাতা হাই কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ পেয়েছে। যার অন্যতম কারণ, যথাযথ পদ্ধতি মেনে এগোয়নি পুলিশ-পুরসভা। বিধির প্রতি এই তাচ্ছিল্য নতুন নয়। কেবল পুলিশ বা রেলকর্তাদের মুখের কথায়, কিংবা আচমকা নোটিস সেঁটে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে বস্তিবাসীদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন নিদর্শন অজস্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পশিক্ষিত, সংগঠনহীন দরিদ্র মানুষেরা সম্মিলিত প্রতিবাদ করতে পারেননি, নীরবে সরে গিয়েছেন। অসরকারি সংস্থা ‘হাউজ়িং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক’-এর তথ্য অনুসারে ২০১৭-২০২৩ সময়কালে ভারতে প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ তাঁদের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, যাঁদের একটি বড় অংশ ‘শহর সৌন্দর্যায়ন’-এর তাগিদে বস্তি উচ্ছেদে ঘর হারিয়েছেন।

উচ্ছেদ এখন বিতর্কের মুখে। এক দিকে নব-নির্বাচিত মন্ত্রী-বিধায়কেরা অভিযোগ করছেন যে, রেল, বন্দর বা পুরসভার জমিতে বস্তিবাসীদের কোনও অধিকার নেই। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে তাঁরা দশকের পর দশক শহরের নানা অঞ্চলে বাস করছেন। এর ফলে সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনায়, রেল বা বন্দরের উন্নয়নে ব্যাঘাত হচ্ছে। তাঁদের এখন উঠে যাওয়াই কর্তব্য। অন্য দিকে, বস্তিবাসীদের নানা সংগঠন এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলন কর্মীরা মনে করাচ্ছেন, জমির মালিকানাই বাসস্থানের একমাত্র প্রমাণ নয়। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, সর্বত্র নাগরিক তথা উপভোক্তার ঠিকানা হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে ‘অবৈধ’ বস্তির ঘরটিই। আদালতও এগুলিকে বৈধ ঠিকানা বলে গ্রহণ করে থাকে। সর্বোপরি, খাদ্য বা পানীয় জল পাওয়ার অধিকারের মতোই, বাসস্থানের অধিকারও মৌলিক অধিকারের অংশ বলেই গণ্য করে আদালত। সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৫ সালের একটি রায়ে (চামেরি সিংহ বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার) জানিয়েছিল, ‘আশ্রয়ের অধিকার’ (রাইট টু শেলটার) মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। ২০১৯ সালের একটি মামলার রায়ে (অজয় মাকেন ও অন্যান্য বনাম ভারত সরকার) দিল্লি হাই কোর্ট জানিয়েছিল, বস্তি উচ্ছেদের আগে সমীক্ষা, বস্তিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা, উচ্ছেদের পর তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, এই সবই করতে হবে সরকারকে।

অতএব এই ব্যবস্থাগুলি না করে উচ্ছেদ করা আইনসম্মত বা নৈতিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও শহরে বস্তি উচ্ছেদের কার্যসূচি নিলে রাজ্য সরকারের তরফে আগে জানানো দরকার, গৃহহারা বস্তিবাসীদের আশ্রয় দেওয়ার মতো যথেষ্ট ‘শেলটার’ রয়েছে কি না, পুনর্বাসনের কী পরিকল্পনা হয়েছে। এগুলি না জানিয়েই ঘর ভেঙে দিলে তা সরকারের উৎপীড়ন বলে মনে হতে বাধ্য। উন্নয়নের কাজে নাগরিকও অংশীদার, সরকারের নীতি যেন তাঁদের প্রতিপক্ষ না করে তোলে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন কাজের মান

অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে স্বনিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, কিন্তু তাঁদের রোজগার কম। পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগচিত্রের বিশ্লেষণ থেকে এমন চিত্রই উঠে এসেছে সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে। ঘটনা হল, কাজের অভাব এবং পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়ে চাপান-উতোরে বহু দিন আটকে রয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধীরা অভিযোগ করছেন যে রাজ্যে যথেষ্ট কাজ নেই, আর শাসক দাবি করছেন যে তাঁরা প্রচুর কাজ তৈরি করেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের কেবল রাজ্যে ফেরার অপেক্ষা। গবেষণা অনুসারে, বিভিন্ন জাতীয় সমীক্ষা থেকে নিষ্কাশিত তথ্য দেখাচ্ছে যে সংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ, অর্থাৎ নিয়মিত বেতনের স্থায়ী কাজে নিয়োগের হার ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে সারা ভারতেই কমেছে, তবে পশ্চিমবঙ্গে কমেছে বেশি। তবে ওই সময়কালে বেতনও বেড়েছে, গড়ে দৈনিক ৩৫২ টাকা থেকে ৪২৫ টাকা (২১ শতাংশ বৃদ্ধি), যদিও এই রাজ্যে এই বেতন জাতীয় গড়ের থেকে কম। প্রকৃত সঙ্কট অন্যত্র। বাকি ভারতে যেখানে বেতনহীন পারিবারিক কাজে নিযুক্তদের সংখ্যা গড়ে ১৭ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা ১০ শতাংশ। পারিবারিক কাজের নিয়োগের অর্থ প্রধানত পারিবারিক খেত-খামারের কাজে বেতনহীন শ্রম। এ রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে এত শ্রমিকের প্রয়োজন নেই। অন্যত্র কাজ না পেয়ে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি প্রধানত ঝুঁকেছে স্বনিযুক্তির দিকে।

ভারতে যেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রধানত বেতনহীন পারিবারিক কাজে বেড়েছে, স্বনিযুক্তদের হারে বিশেষ হেরফের হয়নি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা প্রধানত বেড়েছে স্বনিযুক্তিতে— বর্তমানে দশ জন কর্মীর চার জনই স্বনিযুক্ত— গবেষণায় প্রকাশ। তার পরেই রয়েছে দিনমজুরি, খেতমজুরির মতো অস্থায়ী কাজ (২২ শতাংশ)। দু'ক্ষেত্রেই রোজগার যৎসামান্য। ভারতের গড় রোজগারের থেকে তা অনেকটা কম— ২০২৩-২৪ সালে বাংলার স্বনিযুক্তদের রোজগার ছিল দিনে ২০৭ টাকা, যেখানে ভারতে তা ছিল গড়ে ২৭৯ টাকা। আরও উদ্বেগের বিষয়, এ রাজ্যেস্বনিযুক্তদের প্রকৃত আয় কমেছে, হ্রাসের পরিমাণ সাত বছরে ৭.৫ শতাংশ। এবং তা ঘটেছে এমন সময়ে যখন স্বনিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষত মহিলা শ্রমিকদের যৎসামান্য আয়ের জন্য মরিয়া লড়াইয়ের ছবিটাই ফুটে ওঠে।

সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে স্বনিযুক্তির এই আধিক্য বস্তুত স্বেচ্ছা-উদ্যোগের প্রকাশ নয়, নিয়োগের সুযোগের অভাব। পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব কত কমেছে, তার পরিসংখ্যান দেখিয়ে সাফল্যের দাবি করতে পারে না প্রশাসন। স্বনিযুক্তদের আয়ে পতন কী করে আটকানো যায়, কী করে তাঁরা জীবনধারণের উপযুক্ত রোজগার করতে পারেন, অস্থায়ী কর্মীরা কী করে ন্যায্য মজুরি পেতে পারেন, সে প্রশ্নকে আনতে হবে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। কত কাজ তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে আস্ফালন যথেষ্ট নয়। কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের কাজ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কত রোজগার করা যাচ্ছে, সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। স্বনিযুক্ত কর্মীদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ পৌঁছে দেওয়া, তাঁদের বাজার-সংযুক্তির জন্য সরকারি সহায়তা আরও নিবিড় করা দরকার। উদ্যানপালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি পণ্যের রফতানি পশ্চিমবঙ্গে বাড়তি রোজগারের সুযোগ তৈরি করতে পারে, এ কথা নানা প্রতিবেদনে বার বার আসা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিনিয়োগে খরা রয়েই গিয়েছে। স্বনিযুক্ত ও অস্থায়ী কর্মীদের রোজগারে বৃদ্ধিকে আনা চাই নীতির কেন্দ্রে। ঠিকা মজুরকে যৎসামান্য মজুরি দিয়ে শিল্পকে লাভজনক করার যে অপরিণামদর্শী নীতিটি বহু বছর ধরে চলে আসছে, তাতে রাশ টানতে হবে সরকারকেই। বিভিন্ন সরকারের তরফে নানাবিধ উন্নয়ন-বুলি শোনা যায়, তবে তাঁরা মনে রাখেন না যে, উন্নয়নের প্রধান শর্ত দারিদ্রের ফাঁদ থেকে মুক্তি।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পিছন দিকে এগোনো

ভারতের আর কিছু না থাক, তার বিদ্যাচর্চার মানটি অনেক কাল ধরে বিশ্বময় স্বীকৃত হত। আগের থেকে অনেকাংশে কমলেও সেই মানটি যে একেবারে অবজ্ঞা করার মতো নয়, তার প্রমাণ এখনও ছড়িয়ে আছে গবেষণা জগতের নানা ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান গবেষণার কথাই ধরা যেতে পারে। বহু উন্নত দেশের সঙ্গে শিক্ষা পরিকাঠামোর দিক থেকে বহু পিছিয়ে থাকলেও কেবল মেধার জোরে বিজ্ঞানের ভারতচিত্রটি রীতিমতো উল্লেখনীয় ছিল। ইতিহাস, সমাজবিদ্যা কিংবা সাহিত্য চর্চাতেও ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সুনাম শোনা গিয়েছে বহু দশকব্যাপী। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এই সব ক্ষেত্রেই, মেধা ছাড়াও আর একটি বিষয় ভারতীয় মননকে সাহায্য করত, যার নাম গণতান্ত্রিক আবহ। কোনও বিশেষ মতবাদের নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন চিন্তা বন্ধ করার প্রয়াস অনেক দেশেই দেখা গিয়েছে, ভারত মোটের উপরে আলাদা পথে এগোতে পেরেছে তার রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে। এর অর্থ এমন নয় যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দাপট এ দেশে দেখা যায়নি। তবে সেই দাপট বিদ্যাচর্চার অঙ্গনকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করার প্রয়াস করেনি, কিংবা করে উঠতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত সারস্বত কর্মকাণ্ডে তুলনামূলক স্বাধীনতা শুভফলদায়ক হয়েছে বলা চলে। একই ভারত থেকে জগদীশ ভাগবতী ও অমর্ত্য সেনের মতো দুই দিকপাল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নমতপন্থী অর্থনীতিবিদ তৈরি হয়েছেন, সারস্বত সাধনার বিশ্বমহলে তাঁদের মেধার অসামান্য স্বাক্ষর রেখেছেন। এই দিক থেকে আজ বিষয়টি নতুন ভাবে ভাবার সময় হয়েছে, কেননা আজকের ভারতের একটি নতুন চরিত্র— তার সারস্বত ক্ষেত্রের স্বাধীনতার দ্রুতনিম্নমুখী রেখচিত্র।

উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে সমীক্ষা চালায়, এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘স্কলার্স অ্যাট রিস্ক’ তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই উদ্বেগজনক রেখচিত্রের সন্ধান দিয়েছে। ২০২২ সালে যেখানে অ্যাকাডেমিক ফ্রিডম ইন্ডেক্স-এ ভারতের বিন্দুমান ছিল ০.৩৮, ২০২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ০.১৪। গবেষক ও শিক্ষকদের উপর আক্রমণের নিরিখে ভারত এখন অত্যুচ্চ মাত্রায় রয়েছে, এমন একটি গোষ্ঠীতে ভারতের জায়গা যেখানে তার সঙ্গে আছে হংকং, ইন্দোনেশিয়া, আছে পাকিস্তান, আছে প্যালেস্টাইনের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং ইউক্রেন। ভারতের পরিচালক সমাজ কথায় কথায় পাকিস্তান জুজু দেখতে ব্যস্ত। প্রশ্ন ওঠে, এই দিক থেকে ভারত-পাকিস্তানকে এক জায়গায় নামিয়ে এনে তাঁরা কি প্রীত হয়েছেন? এখান থেকে আবার নতুন করে পূর্ব মানে ফিরতে— যদি আদৌ ফেরা যায়— কয়েক প্রজন্ম সময় লেগে যেতে পারে, কেননা কিছু কিছু বস্তু এক বার ধ্বংস করলে তার পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। তবে ভারতের পক্ষে একটি ‘সুখবর’ দেশবাসীকে ‘খুশি’ করতে পারে। এই রিপোর্ট বলছে, ভারত একেবারে তলানিতে নেই, তারও নীচে আছে কিছু দেশ, যেমন আফগানিস্তান, চিন, ইরান, রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, গাজা। ভারত এই গতিতে পিছিয়ে গেলে নিশ্চয়ই এদেরও ধরে ফেলতে পারবে, তবে এখনও যে বিশ্বের সর্বনিম্ন ধাপটিতে পৌঁছনো যায়নি, এও তো নিশ্চয়ই ‘শ্লাঘা’র বিষয়!

সারস্বত স্বাধীনতা বিষয়টি সরাসরি নির্ভর করে চিন্তার মুক্ত পরিসরের উপর, এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রবেশ করানোর পরিমাণের উপর। এই যেমন, স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের বইতে মোগল আমলের ইতিহাস বাদ দিতে হবে, কিংবা সমসাময়িক অন্য জাতীয়তাবাদী নেতারা যা-ই করে থাকুন না কেন, এখন থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই বিস্তারিত ভাবে পড়াতে হবে, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করতে হবে, গোমূত্রের উপকারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে গবেষণা চালাতে হবে, এই সব নির্দেশ স্বাধীন চিন্তার পথে প্রতিরোধক তৈরি করার পক্ষে অতি উপযোগী! এই ভারতে ক্রমশই সেই প্রতিরোধক গুণগত ভাবে ও পরিমাণগত ভাবে বেড়ে চলেছে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সঙ্কটাপন্ন

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিংহ সান্ধু ও বিবেক জোশীর যে অভিযোগ ঝড় তুলেছে, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সেই 'অনুমোদনহীন ও বেআইনি' সিদ্ধান্তগুলির শিকড় সন্ধান করতে হলে তিন বছর পিছিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ২০২৩ সালে সংসদে পাশ হয় চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অব সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অব অফিস) অ্যাক্ট। এই আইনের মাধ্যমে যে তিন সদস্যের কমিটির হাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তা থেকে বাদ পড়েন দেশের প্রধান বিচারপতি— প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি তাঁর জায়গায় আসেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত এই আইন সংক্রান্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে, এই ব্যবস্থায় কমিটিতে বিরোধী দলনেতার উপস্থিতি নিছকই আলঙ্কারিক, কারণ প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে মত দেবেন, এমনটা আশা করা মুশকিল। বলা যেতে পারে, এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর কোনও বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রত্যক্ষ নিয়োগকর্তা। অনুপ বরণওয়াল (২০২৩) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিরোধ রয়েছে কি না, সে প্রশ্ন আদালতের বিচারের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত যে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন— নির্বাচন কমিশন শুধু নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, তার নিরপেক্ষ প্রতিভাত হওয়া দরকার— এই ব্যবস্থায় সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব।

এই একই আইন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের এই ভূমিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোনও ফৌজদারি মামলার আওতার বাইরে রেখেছে— এবং, তা শুধু তাঁদের কার্যকালের জন্য নয়, আজীবন। ভারতীয় গণতন্ত্রে এমন রক্ষাকবচ সুলভ নয়, এবং ২০২৩-এর আগে কখনও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য এ-হেন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়নি। নিয়োগ পদ্ধতি এবং তৎপরবর্তী রক্ষাকবচ— দুইয়ের বিরুদ্ধেই যে অভিযোগটি উঠছে, তা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ হিসাবে প্রতিভাত হওয়ার সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে যে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ থেকে চাকরির মেয়াদ, সবই যখন প্রধানমন্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল, এবং তাঁর যে কোনও কাজই যে-হেতু অভিযোগযোগ্য নয়, ফলে তিনি নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে রাজনৈতিক আনুগত্য অনুসারে কাজ করেছেন। দুই কমিশনার সান্ধু ও জোশীর অভিযোগগুলি যথার্থ কি না, তা বিচারসাপেক্ষ— কিন্তু, এমন অভিযোগ যে উঠছে, এবং জনমানসে যে তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, এ কথা গণতন্ত্রের পক্ষে দুঃসংবাদ।

এই মুহূর্তে প্রশ্নটি শুধুমাত্র শাসক বনাম বিরোধী রাজনীতির নয়, প্রশ্নটি গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার যে প্রশ্নের সম্মুখীন, তার বৈধতা এখনই বিচার্য। এই অবস্থায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার কথা দেশের বিরোধী রাজনীতির। শীর্ষ আদালতে ২০২৩-এর আইনটি বিচারাধীন। কিন্তু, তার বাইরেও অজস্র প্রশ্ন তোলার সুযোগ, অধিকার এবং কারণ বিরোধীদের রয়েছে। কোনও ব্যক্তির পদত্যাগেই সমস্যার সমাধান হবে না— গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর এই কাঠামোগত পরিবর্তনকে প্রশ্ন করা এবং তার জন্য উদ্ভূত সঙ্কটের মোকাবিলা করা এই মুহূর্তে বিরোধীদের প্রধান কর্তব্য। অথচ সেই কর্তব্যপালনে এখনও যূথবদ্ধ অবস্থান নেই। ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আগেও অনেক সমালোচনা তৈরি হয়েছে, এখনও তার প্রভূত অবকাশ আছে। তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের এই ক্রান্তিকালে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষেরই মনে রাখা উচিত, তাদের সিদ্ধান্তই কিন্তু গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎরেখা স্থির করবে। ইতিহাস তাদের সেই ভূমিকা স্মরণে রাখবে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ভাঙনের তোড়

ভরা বর্ষায় সুন্দরবনে নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। বছর দুয়েক আগেও বঙ্গোপসাগরে হাজির হওয়া নিম্নচাপ এবং কটালের জোড়া ধাক্কায় প্রবল বিপদে পড়েছিল গঙ্গাসাগর-সহ বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগ। কটালের কারণে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগরের বিভিন্ন এলাকায় বাঁধের মাটি আলগা হয়ে যায়। বাঁধ উপচে, ফাটল দিয়ে জল ঢোকে এলাকায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়ে নামখানার মৌসুনি দ্বীপ। সম্প্রতি ফের অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন সুন্দরবন। নিম্নচাপ-পরবর্তী প্রভাব এবং সেপ্টেম্বরের কটালের জলোচ্ছ্বাসে ফের ক্ষতি হয়েছে একাধিক এলাকার নদীবাঁধের। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পাথরপ্রতিমার জি-প্লটের গোবর্ধনপুর। সেখানে ৬৫০ মিটারের বাঁধ ধুয়ে গিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে আছে অন্য একটি তথ্যে। গত তিন দশকে এই গোবর্ধনপুরেই বাঁধ তৈরির চেষ্টা হয়েছে অন্তত ছ'বার। কংক্রিটের বাঁধও সেখানে স্থায়ী হয়নি। সেটি ভেঙে গেলে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে তার পিছনে মাটির রিং বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি জমি অধিগ্রহণজনিত সমস্যায়। জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছে এ সবের মধ্যেই। এবং সেই আঘাতে ফের বাঁধের বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এই চিত্রই সুন্দরবনের বাস্তব। নদীবাঁধ গড়া, ভাঙা, কংক্রিটের স্থায়ী বাঁধের প্রতিশ্রুতি— এ সবের মধ্য দিয়েই বাদাবনের দিনযাপন। অতএব সুন্দরবন নিয়ে সরকারি স্তরে ভিন্ন পথে ভাবনার প্রয়োজন। কেন এই অঞ্চলে কংক্রিটের বাঁধও টিকছে না, বিকল্প কী হতে পারে— এই বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা, এবং প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ জরুরি। সবচেয়ে জরুরি, বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘ সরকারি অনাগ্রহ, সেচ ও ভূমি সংস্কার দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের মতো রোগগুলি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা। কংক্রিটের বাঁধের পিছনে বাড়তি সুরক্ষা জোগানোর জন্য মাটির রিং বাঁধ আবশ্যক হলে জমিজট কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সর্বাধিক বিপন্ন অঞ্চলের অন্যতম সুন্দরবন। তার প্রমাণ দেখা গিয়েছে এই অঞ্চলে একের পর এক শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড়ের আছড়ে পড়ার ঘটনায়। সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পেয়ে, বাঁধ ভেঙে ইতিমধ্যেই বহু দ্বীপের জমি তলিয়ে গিয়েছে। বাঁধ-সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বহু মানুষ ঘরছাড়া, জীবিকাহারা হবেন। সাময়িক ভাবে তাঁদের আশ্রয়শিবিরে রেখে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই সমস্যা মিটবে না।

এক বার বাঁধ ভাঙলে তার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। বাঁধ ভেঙে ঢোকা সাগরের নোনা জল শুধুমাত্র ঘরবাড়িকেই গিলে খায় না, জমি, পুকুরে সেই জল জমে বিপুল ক্ষতি হয় চাষবাস ও মৎস্যচাষেরও, যা দরিদ্র অনুন্নত এই অঞ্চলের অন্যতম জীবিকা। নড়বড়ে নদীবাঁধের উপর নির্ভরশীল বাসিন্দারা কটালের দিনে, দুর্যোগের সংবাদ শুনে আতঙ্কের প্রহর গোনেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার সুন্দরবন নিয়ে নানা পরিকল্পনা শুনিয়েছে। কিন্তু তাতে পর্যটন সংক্রান্ত লক্ষ্মীলাভের প্রসঙ্গ যতখানি আছে, গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণার আগ্রহ যতখানি আছে, বাঁধ-নির্ভর বাসিন্দাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন, কার্যকর পদক্ষেপের আশ্বাস ততখানি নেই। সুন্দরবনের অন্ধকার তাই সহজে কাটবে না।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন অস্তিত্বসঙ্কট

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় সম্প্রতি একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হল— 'ইউএন ডিক্লারেশন অন সি-লেভেল রাইজ'। সেখানে অনেক দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্বসঙ্কটের কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি। সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান বা কাছাকাছি উষ্ণতায়, অথবা তার নীচে রয়েছে যে দেশগুলি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় ক্ষয়ের জেরে তারা রয়েছে বড়সড় ঝুঁকির মুখে— হারিয়ে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব ভৌগোলিক ভূখণ্ড। এ যেন বাংলার গ্রাম-জনপদে নদীর পাড় ভেঙে পড়ার পরিচিত ও করুণ দৃশ্য— অসহায় মানুষ দেখছেন, চোখের সামনে কী ভাবে পাড় ভেঙে জমি-বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। বৃহত্তর সমাজ একে দেখে 'কিছু মানুষের ক্ষতি' হিসেবে, ক্ষণিকের সমবেদনা প্রকাশ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের কাজে। কিন্তু এই একই সঙ্কট যখন ধারে-ভারে অনেক বড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়তনে ছোট একটি দেশকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূখণ্ড হারাতে হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে, তখন তা হয়ে ওঠে জীবন-মরণ সমস্যা। ঠিক এটাই হয়ে চলেছে এখন পৃথিবীতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির জেরে উপকূলের ক্ষয় ও বন্যা হচ্ছে নিয়ম করে, মিষ্টি জলের উৎসে ঘটছে লবণাক্ত জলের 'অনুপ্রবেশ'। বিপুল সংখ্যক মানুষের বাড়িঘর, বাস ও চাষের জমি, জীবন ও জীবিকার পরিকাঠামোও পড়ছে ঝুঁকির মুখে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়ছে কেন? প্রধান দু'টি কারণ— পৃথিবীর হিমবাহ ও বরফের স্তর গলে যাওয়া, আর সমুদ্রের জলের তাপজনিত প্রসারণ। দুই-ই ঘটছে বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে, এ আজ অজানা নয়। ওয়ার্ল্ড মেটিরিয়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন প্রকাশিত ২০২৫-এর 'স্টেট অব দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট' রিপোর্ট অনুযায়ী সে বছর বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা তার আগের বছরের রেকর্ড উষ্ণতার কাছাকাছি ছিল। দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩-২০১১ পর্যন্ত সময়ের তুলনায় ২০১২ থেকে অদ্যাবধি বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির হার বেড়েছে অনেক। এই সবই বৈজ্ঞানিক ভাবে, কৃত্রিম উপগ্রহের রেডার অল্টিমিটার, টাইড গেজ-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসূত্রে পাওয়া তথ্য— অলীক কল্পনা নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির নিকটসম্পর্ক নেই বলেই যে তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই তা কখনওই নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো বৈশ্বিক পরিসর আসন্ন বিপদসঙ্কেত বুঝেই সংশ্লিষ্ট ঘোষণাপত্রটি সামনে এনেছে।

এই সূত্রেই উঠে এসেছে আরও এক জরুরি প্রশ্ন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি কিছু দ্বীপরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে আইনি তাৎপর্যময়— এ ভাবে ভূখণ্ড হারাতে থাকলে, বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হলে ভবিষ্যতে কি তাদের রাষ্ট্রসত্তা তথা 'স্টেটহুড'ও প্রশ্নের মুখে পড়বে? এ প্রসঙ্গে ফিরে দেখা যেতে পারে ১৯৩৩ সালের মন্টেভিডিয়ো কনভেনশন অনুযায়ী চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি দেশকে প্রকৃত অর্থেই 'স্টেট' বলা যাবে: ১. একটি স্থায়ী জনসংখ্যা, ২. সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ৩. সরকার, এবং ৪. অন্য দেশের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের সামর্থ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি সরাসরি সম্পর্কিত (এমনকি অন্যগুলিও পরোক্ষত), এবং সেই কারণেই এই মুহূর্তে এই আলোচনা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশদে হওয়া দরকার। গত এক দশকে বেশ কয়েকটি দেশ এই বিষয়টি নিয়ে তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা জানিয়েছে— প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র রিপাবলিক অব কিরিবাটি ২০১৫ সালেই জানিয়েছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেশ তথা রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে। পাঁচ বছর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন (সিওপি ২৬)-এ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য-দেশ টুভালু-র প্রতিনিধি এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন সমুদ্রের হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে। তাঁর দাবি ছিল, যে জায়গাটিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেটি এক সময় ছিল শুকনো ডাঙা, সম্পূর্ণত স্থলভাগ— উপকূলীয় ক্ষয় যে জায়গাটি কেড়ে নিয়েছে। এ বিষয়টি তর্কাতীত যে, কোনও ভূখণ্ড মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে তার স্থায়ী জনসংখ্যার শর্তটিও প্রশ্নের মুখে পড়ে। রাষ্ট্রসত্তার পুরনো পরিচিত সংজ্ঞা ও জলবায়ু বিপর্যয়-উত্তর সংজ্ঞার পার্থক্য নিয়ে কথা উঠেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে অবশ্য এই স্বীকৃতি মিলেছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভূখণ্ডের ক্ষয় বা বিলোপ মানে রাষ্ট্রসত্তার বিলোপ নয়; আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তার সার্বভৌমত্বও বজায় থাকবে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন বার্ধক্যের পথে

ভারতের নাগরিকদের এক বৃহৎ অংশ তরুণ। ফলে, অনেক উন্নত দেশ যখন বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্যের মোকাবিলায় পদক্ষেপ করতে ব্যস্ত, তখন ভারত তরুণদের আধিক্যজনিত কারণে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট'-এর সুবিধা লাভ করছে। কিন্তু এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হবে না। কারণ, ভারতও বৃদ্ধ হচ্ছে। গবেষণা সংস্থা মুডি'জ়-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ২০২৪ সাল নাগাদ ভারত 'বয়স্ক জনগোষ্ঠী বিশিষ্ট' দেশের তালিকায় প্রবেশ করে ফেলেছে। অনুমান, সে 'বয়স্ক' হবে ২০৪৯ সাল নাগাদ। তার পর মাত্র মাত্র ষোলো বছর, অর্থাৎ ২০৬৫ সালেই সে 'অতি বয়স্ক' জনগোষ্ঠীর দেশে পরিণত হবে। এর অন্যতম কারণ— জন্মহার দ্রুত কমে যাওয়া এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় হার বা প্রতিস্থাপনযোগ্য স্তরের নীচে প্রজনন হারের নেমে যাওয়া। তার একটা ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল 'স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট, ২০২৪'-এ। সমীক্ষাটি দেখিয়েছিল, এই প্রথম বার প্রতিস্থাপনযোগ্য স্তরের নীচে নেমে গিয়েছে ভারতের মোট প্রজনন হার (টিএফআর)। ২.১-এর পরিবর্তে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১.৯-এ। যদিও সেই হার দেশের সর্বত্র সমান নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রজনন হারের নিরিখে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। মোট জন্মহার সর্বাধিক হ্রাস পেয়েছে দিল্লিতে। সর্বনিম্ন তালিকায় রয়েছে কেরল, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গও। এক দিকে প্রজনন হার হ্রাস পাওয়া, অন্য দিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে জীবনকাল ক্রমশ দীর্ঘায়িত হওয়া এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে দেশের বুড়িয়ে যাওয়ার চাবিকাঠিটি।

বিভিন্ন রিপোর্টে স্পষ্ট, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে প্রতি পাঁচ জন নাগরিক পিছু এক জন ষাটোর্ধ্ব হবেন। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিশ্বের যে সমস্ত উন্নত দেশ এর আগে বৃদ্ধ হওয়ার পথে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের তুলনায় আয়ের নিরিখে ভারত এখনও বহু পিছনে পড়ে আছে। অর্থাৎ, ধনী হওয়ার পূর্বেই বৃদ্ধ হচ্ছে ভারত। এই পরিসংখ্যানগুলি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, নিঃসন্দেহে তা আগামী দিনে পরিবার এবং স্থানীয় পরিচর্যা ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করবে। এমনিতেও পরিবর্তনশীল সমাজে প্রবীণদের সহায়তা দানকারী ভিত্তিটি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। প্রত্যেক প্রবীণকে সহায়তা দিতে সক্ষম কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা ২০০১ সালেও এ দেশে ছিল ৮.৪, যা এই বছর নেমে এসেছে ৫.২-এ। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-সহ বেশ কিছু সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, এ দেশের চিরায়ত পারিবারিক পরিচর্যার ধারণাটি বদলে যাচ্ছে পরিবারগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হয়ে যাওয়ায়। তদুপরি, পরিবারের তরুণ সদস্যরাও কাজের সন্ধানে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে প্রবীণদের দেখাশোনার বিষয়টি আগামী দিনে জটিলতর হতে চলেছে।

পরিসংখ্যানে প্রকাশ, দেশের অধিকাংশ প্রবীণই নানা ধরনের অসংক্রামক জটিল রোগের শিকার। তার জন্য হাসপাতাল-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, ওষুধের সহজলভ্যতা এবং যে পরিমাণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মজুত থাকা প্রয়োজন, এ দেশে, এখনও তার অভাব প্রকট। সন্তানরা কর্মসূত্রে বাইরে চলে যাওয়ায় যে প্রবীণরা একাকী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের জন্য উপযুক্ত বৃদ্ধাবাসই বা ক'টি রয়েছে? গ্রাম, শহর— উভয় জায়গাতেই প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে তাঁদের উপর নির্যাতনের হারও। সেই সব অসংখ্য ঘটনার ক'টিই বা পুলিশ-প্রশাসন অবধি পৌঁছতে পারে? অধিকাংশেরই নেই আর্থিক স্বাবলম্বন। প্রবীণদের সুরক্ষায় রাষ্ট্র কিছু পদক্ষেপ করেছে ঠিকই, আদালত কিছু যুগান্তকারী রায়ও দিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকার মতো শারীরিক সামর্থ্যই বা ক'জনের আছে? সময় বেশি নেই। ভবিষ্যতের বৃদ্ধ ভারতকে সুস্থ-সবল ও স্বনির্ভর রাখতে ভাবনাচিন্তা এখনই শুরু হোক।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন শিশুর দাবি

অসাম্যের ক্ষত যে সব উপায়ে প্রকাশ পায়, তার অন্যতম হল খিদে। ভারত এখন বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি, কখনও কখনও পঞ্চম বা চতুর্থ স্থানেরও দাবিদার হয়েছে। কিন্তু ক্ষুধার সূচকে ভারতের স্থান নিরানব্বইটি দেশের পিছনে। গত বছরের অবস্থান (১০২) থেকে খানিক উন্নত বটে, কিন্তু এখনও 'গুরুতর ক্ষুধা' শ্রেণির বাইরে বেরোতে পারেনি ভারত। যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এই সূচক প্রকাশ করে, তাদের পরিমাপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভারতের 'স্কোর' ২০০০ সালে ৩৮.১ থেকে ২০২৬ সালে ২৪.১-তে এসেছে। শ্রীলঙ্কা একই সময়ে ২১.৪ থেকে উন্নীত হয়েছে ১০.৪ অবস্থানে, চিন ১৩.৪ থেকে পাঁচেরও নীচে। যা ফের স্পষ্ট করে, বিশ্বায়িত অর্থনীতির সুবিধে ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। অতি মন্থর গতিতে অতি সামান্য পরিবর্তনকে 'উন্নতি' বলা চলে না, বিশেষত যেখানে বিলম্বের মূল্য চোকাতে হচ্ছে শিশুদের। ২০২৬ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক মেপেছে চারটি বিষয়— অপুষ্টি, শিশুদের খর্বাকৃতি (স্টান্টিং), শিশুদের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ওজনে ঘাটতি এবং পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মৃত্যুহার। ফলাফলে প্রকাশ, ভারতে জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে; পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের ২৯ শতাংশ অপুষ্টির ফলে খর্বাকৃতি, ১৯ শতাংশ শিশু রোগা— অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাদের ওজন কম, এবং ২.৭ শতাংশ শিশু পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়। ২০০০ সালে শিশুদের খর্বাকৃতির হার ৫০ শতাংশ ছিল। তা ছাড়া তিন জনে এক জন শিশু অপুষ্ট, এ ছবিও স্বস্তিকর নয়।

অপুষ্টির এই লজ্জাজনক ছবি তুলে ধরলেই সরকারের তরফে দেওয়া হয় কিছু পাল্টা পরিসংখ্যান— ৮০ কোটি নাগরিক রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলভে চাল-গম পাচ্ছে, শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার পাচ্ছে, স্কুলে মিড-ডে মিল পাচ্ছে, ইত্যাদি। এ ভাবে শিশুর দৈহিক-মানসিক বৃদ্ধির প্রশ্নটিকে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রকল্পের পরিধিতে টেনে আনা হয়। তাতে আড়ালে পড়ে যায় পরিবারের কর্মহীনতা, কাজের অনিশ্চয়তা, সামান্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। অথচ, শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার পেল কি না, তা প্রধানত এগুলির উপরেই নির্ভর করে। বিশেষত দরিদ্র মাকে সামান্য আয়ের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হলে তা শিশুর জীবনে নানা ভাবে ছাপ ফেলে যায়। রোজগারে বৈষম্য থেকে যাচ্ছে, আয়বৃদ্ধিকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যাচ্ছে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, দরিদ্র পরিবারের উপর এগুলির অভিঘাত সামাল দিতে পারছে না সরকারি প্রকল্প। নীতি আয়োগ শিশু পুষ্টির প্রধান নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছে দারিদ্র, আয়ের অসম বণ্টন, মায়ের শিক্ষার হার এবং নারীর সামাজিক অবস্থানকে। কিন্তু পুষ্টি-বিধানের সরকারি উদ্যোগে এই সামগ্রিক চিন্তার ছাপ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অতএব ফের প্রশ্ন করা দরকার, খাদ্য জোগানোর প্রকল্পগুলি দীর্ঘ দিন চলার পরেও কেন শিশু-অপুষ্টির চিত্রে পরিবর্তন আসেনি? মিড-ডে মিল-এ বাড়তি বরাদ্দের আস্ফালন যথেষ্ট নয়, সেই বরাদ্দে শিশুর প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফল, আনাজপাতি থাকছে কি না, শিশুরা দিনে একবার সুষম আহার পাচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি দীর্ঘ দিন অবহেলিত। পরিকাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন, মা ও শিশুর জন্য রুচিকর, পুষ্টিকর খাবারের জন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা দরকার। নজর দেওয়া দরকার নিরাপদ পানীয় জল, শৌচ-নিকাশি ব্যবস্থার দিকে, কারণ ঘন ঘন পেটের রোগ অপুষ্টির অন্যতম কারণ। নজর দাবি করে প্রান্তিক, বৈষম্য-পীড়িত জনগোষ্ঠীগুলি। দলিত, মুসলিম, বা জনজাতি-প্রধান গ্রাম; ভাটা, খনি বা খাদান-সংলগ্ন এলাকা; বন্ধ বাগান ও কারখানা-সংলগ্ন পরিবার; পরিযায়ী শ্রমিক, অনিশ্চিত জীবিকার উপর নির্ভরশীল পরিবারের শিশুদের যত্নের প্রয়োজন। টাকার অঙ্ক নয়, 'যত্ন'-ই হয়ে উঠতে হবে সরকারি উদ্যোগের পরিমাপ।